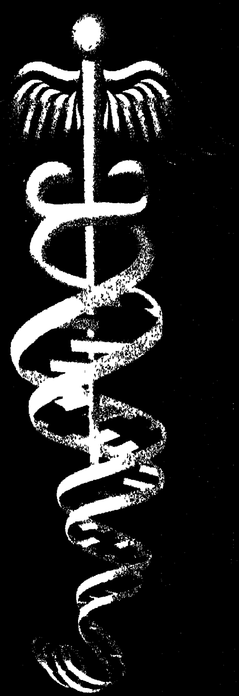
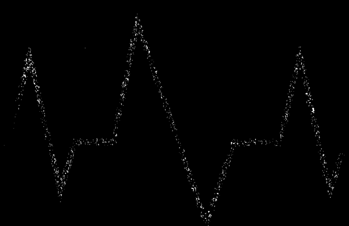
ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন কেন যাবেন







দীনেশ চন্দ্র সাহা

ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন কেন যাবেন



দীনেশ চন্দ্র সাহা

রাইটার্স পাবলিকেশন
আগরতলা, ত্রিপুরা

ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন কেন যাবেন

Daktarer Kachhe Kakhan Jaben Kena Jaben
by Dinesh Chandra Saha
Published by - Writers Publication
Palace Compound, East, Near Town Hall No.....
Agartala, Tripura@Pin-799001
(M) +91-9862610480
Price - Rs.120 only

প্রথম প্রকাশ	-	বইমেলা - ২০১১
প্রকাশক	-	দীনেশ চন্দ্র সাহা
অক্ষর বিন্যাস	-	গ্রাফিক্স প্রয়াস, ৯৭৭৪১৬০২৬৬ আগরতলা - ত্রিপুরা
মুদ্রণ	-	অনিল লিথোগ্রাফিং কোং ১৩, শশীভূষন দে স্ট্রীট, কলকাতা - ১২
প্রচ্ছদ	--	দীপঙ্কর দেববর্মা
মূল্য	-	১২০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-81-904859-9-9

প্রাপ্তি স্থান

রাইটার্স পাবলিকেশন

প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট, টাউন হলের পাশে, আগরতলা, ত্রিপুরা

মো ঃ ৯৮৬২৬১০৪৮০

লেখকের কথা

স্বাস্থ্য সচেতনতা আজকের যুগে একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। শিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক উন্নয়নের ফলেই এই আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং উন্নতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তাছাড়া আমাদের পৃথিবীটাও বদলে গেছে। পরাধীনতার বন্দিশালা থেকে পৃথিবীর সব দেশই মুক্ত হয়েছে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা এখন প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার রূপে গণ্য হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। সারা বিশ্বের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময়, পরামর্শদান এবং সাহায্য সহযোগিতা ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণেই বহু দেশে সাধারণ মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য, পানীয় জল এবং জীবনযাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করলেই মৃত্যুহার অর্দ্ধেক কমানো যায়।

স্বাস্থ্য সচেতনতার আন্দোলনের ফলে পৃথিবীর সব দেশেই মৃত্যু হার অনেক কমেছে। আমাদের দেশেও কমেছে। কয়েক দশক আগেও কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি সংক্রামক রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হতো। বর্তমানে এসব রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক সমাজে যেসব রোগ মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে তার অধিকাংশই মানুষের দোষেই সৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, হার্টের বিভিন্ন অসুখ, কিডনী, লিভার, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াস ইত্যাদি অনেক রোগই পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের খাদ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনের জন্যই মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। খাদ্য ও জীবনযাত্রা

প্রণালীর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারলেই আধুনিক রোগের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

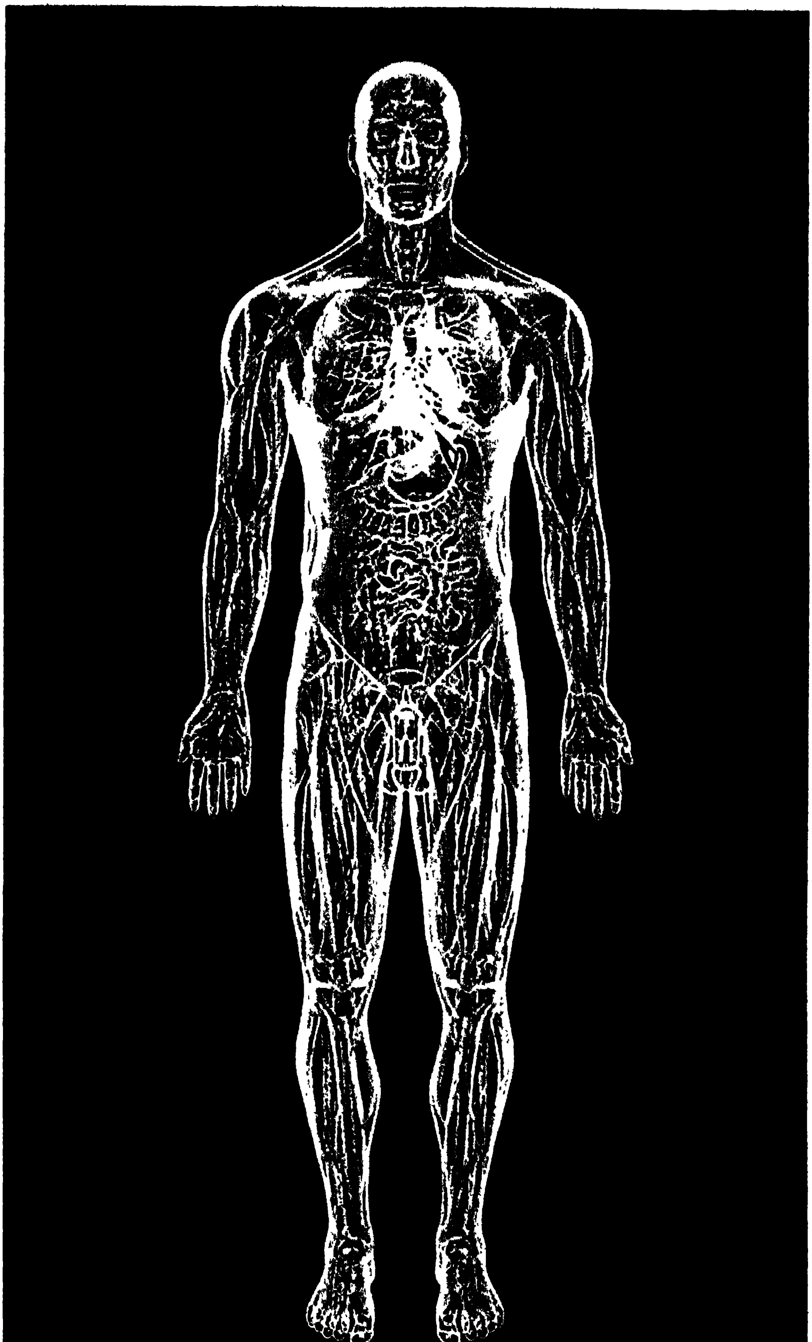
কি কি কারণে কি কি ধরনের রোগ হতে পারে এবং তা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এ বিষয়ে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিভিন্ন মিডিয়ায় যেসব মতামত প্রকাশ করছেন এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রচার করছেন তাদের পরামর্শ ও তথ্যগুলোকে সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য সরল ভাষায় এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সাধারণ মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি কিছু পরিমাণেও উপকৃত হন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

—নিবেদক

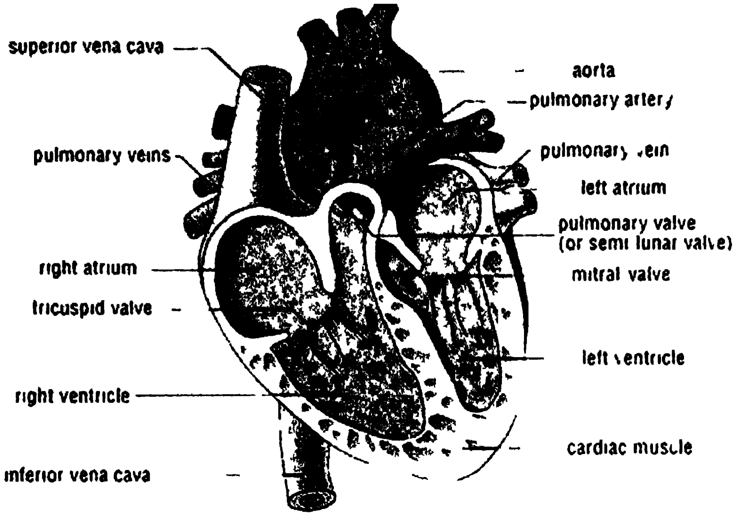
আগরতলা
বইমেলা-২০১১

দীনেশ চন্দ্র সাহা
লেখক ও প্রকাশক।

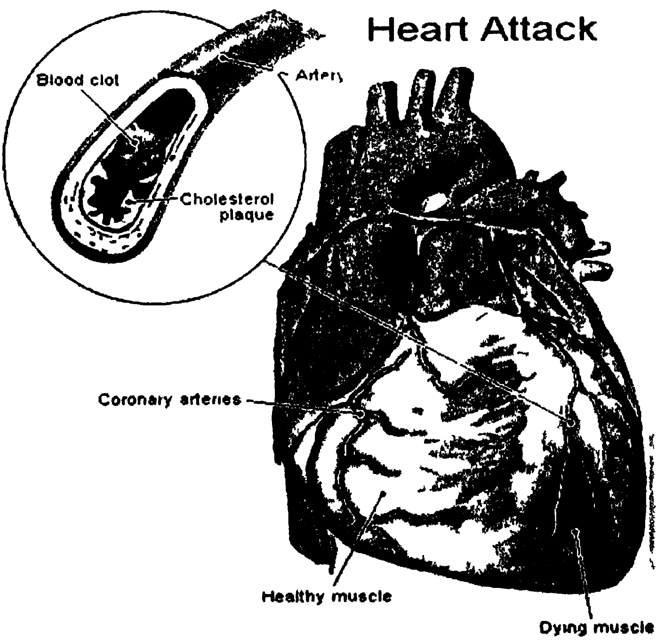




মানবদেহ



সুস্থ হার্ট



অসুস্থ হার্ট

সূচীপত্র

স্বাস্থ্য সচেতনতা

আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বিস্তারের কাজও চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনটিতেই আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে এবং নতুন নতুন রোগের আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে।

ভৌগোলিক কারণে এবং পরিবেশগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আবার খাদ্য ও জীবন ধারার প্রভাবে সারা বিশ্বের সব দেশেই কিছু কিছু রোগ আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। যেমন হার্ট, সুগার, ব্লাডপ্রেসার, ক্যান্সার।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষই কোন না কোন ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। ৫০ বছর আগেও ভারতের সর্বত্র কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর গ্রামের পর গ্রামে মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়তো আর লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। বহুকাল এসব রোগের কারণ জানা ছিল না, তাই কোন ঔষধও আবিষ্কৃত হয়নি। আনুমানিক চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যেত না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যখন রোগ জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং রোগের কারণ বুঝতে পারলেন তখনই নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হল এবং মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করা গেল। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য চেতনার বিকাশ শুরু হল। জানা গেল যে, মশা, মাছি, দূষিত জল ও দূষিত খাদ্য এসবই সংক্রামক রোগের মূল কারণ। তাই সতর্ক থাকলে সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, এই চেতনা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লো। অপদেবতার কোপ দৃষ্টির ফলে মহামারি রোগ সৃষ্টি হয়, এ ধরনের কুসংস্কার দূর হল। কিন্তু নিরক্ষর মানুষেরা এখনো কুসংস্কার মুক্ত হয়নি।

একই সময়ে যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই- বলে একটা ধারণা প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। ধনী, দরিদ্র, রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশা যে কেউ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেত না। বিজ্ঞানীরা এই রোগের কারণ এবং ঔষধ আবিষ্কার করার পর সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পেল। বাঁচার

পথ সহজ হল। এখনো পৃথিবীর সব দেশে বহু লোক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসা এখন অনেক উন্নত হয়েছে।

আরেক রোগ কুষ্ঠ। বহুকাল এই রোগের সুচিকিৎসার সুযোগ ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছেন। এখন চিকিৎসার দ্বারা রোগ মুক্ত হওয়া যায়।

সর্দি, কাশি, অম্বল, গ্যাস, বদহজম এগুলো কোন রোগ নয়। এগুলোর চিকিৎসা অভিজ্ঞতার আলোকে আবিষ্কৃত ঘরোয়া চিকিৎসায় সারিয়ে তোলা যায়। সতর্কতার অভাবে এসব রোগ হয়। এগুলোর জন্যও এখন উন্নতমানের ঔষধ পাওয়া যায়। চিকিৎসার সুযোগও সহজলভ্য হয়েছে। যেকোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসবের চিকিৎসা করা হয়।

পুরানো সব রোগের সঙ্গে আধুনিক নানা জটিল রোগের আবির্ভাব আধুনিক যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও জটিল করে তুলেছে। আজকাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ এবং বিত্তবানদের প্রায় সবাই ব্লাডপ্রেসার, সুগার, হার্ট, কিডনী স্টোন, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার ইত্যাদি নানা রোগের শিকার হচ্ছেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা থাকলেও খাদ্য এবং জীবনধারায় সংযম না থাকার ফলে অকাল মৃত্যু বরণ করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। অসংখ্য ধরনের ঔষধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসার খরচ সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটা ক্ষতিগ্রস্ত কিডনী বদলাতে হলে প্রথমেই দশ থেকে পনের লক্ষ টাকার দরকার। সুস্থ কিডনী দাতার উপর নির্ভর করে রোগীর জীবন। ক্ষতিগ্রস্ত লিভার বদল করাও সম্ভব কিন্তু প্রথমেই দরকার হবে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। হার্টের চিকিৎসাও ক্রমাগত অনেকের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবে প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়।

ক্যান্সার আরেকটি কঠিন রোগ। যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই এর মতই প্রবাদ বাক্য ছড়িয়ে গেছে ক্যান্সার রোগের অ্যানসার নেই। তেমনি আরেকটি নতুন রোগ এইডস যার কোন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তবে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে ক্যান্সারেরও অ্যানসার খুঁজে পাওয়া যায়। এইডস রোগীকেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা যায়।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ ও যত্ন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক সমাজে জীবাণু ঘটিত রোগের চেয়ে দেহযন্ত্রের বিকৃতি ও কর্মক্ষমতা লোপের ফলে উৎপন্ন রোগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। হার্ট, কিডনী, লিভার, প্যানক্রিয়াস, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র অকেজো হয়ে বহু লোকের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। রোগী নিজেই এসব রোগের জন্য দায়ী। অনিয়ম, অসংযম, অনিদ্রা, অখাদ্য, কুখাদ্য, ভুরিভোজন, পরিশ্রম বিমুখতা, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, হতাশা, উচ্চাশা, লোভ, হিংসা, প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিক যুগের নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একটা রোগের প্রতিকার করতে না করতেই আরেকটা নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। আধুনিক যুগের এসব রোগ কোন একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এসব রোগ ব্যাপক আকার নিচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমাগত বাড়ছে। মাটির ক্ষয় হচ্ছে এবং উর্বরতা কমছে। জল, বায়ু এবং মাটি দূষিত হবার ফলে পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। বহু প্রাণী, উদ্ভিদ, কীট, প্রত্যঙ্গ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর ৪৬ লক্ষ হেক্টর চিরসবুজ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। হিমবাহ গলে যাচ্ছে। নদীর জল বেড়ে যাচ্ছে। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। কৃষির জন্য জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। সমুদ্রের জলে বহু দ্বীপ এবং উপকূলের বহু দেশ ডুবে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে মানুষের বিবেকহীন অনাচার মানব সমাজের সামনে নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনছে। জল দূষণ এবং বায়ু দূষণের জন্য মানুষই দায়ী। দূষিত আবর্জনা শোধন না করেই নদী-নালা-খাল-বিল ও সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। শিল্প-কারখানার আবর্জনা এবং কালো ধোঁয়ার পরিমাণ প্রতিদিন বাড়ছে। আনবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, নানা ধরনের রাসায়নিক কারখানার বিষাক্ত পদার্থ জল-বায়ু-মাটি বিষাক্ত করছে। কৃষিতে অতিরিক্ত সার এবং কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার খাদ্যবস্তুকে দূষিত করছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। প্রতিটি দেশের সরকার এবং নাগরিকদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এসব বিষয়ে জনচেতনা বৃদ্ধির নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমাদের স্বাস্থ্য খাদ্য, পানীয় এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে সবাই যদি সতর্ক না হয় এবং সংযমী না হয় তবে স্বাস্থ্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ভারতে চরম দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ। আবার শিক্ষিত ও বিত্তবান মানুষেরা বেপরোয়া জীবনযাত্রার কারণে ভয়ানক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছেন। সমস্যা যখন তৈরী হয়ে যায় তখন স্বাস্থ্য সচেতন হয়েও অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া অর্থবানদের জন্যও আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেশের কয়েকটি বড় শহরেই সীমাবদ্ধ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন রাজ্যেই এখনো পর্যন্ত হার্ট, কিডনী-লিভার ইত্যাদির আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এমনকি প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের সুব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি। সঠিক মুহূর্তে সঠিক চিকিৎসার সুযোগের অভাবে বহু মূল্যবান জীবন অকালে ঝরে যায়।

সুস্থভাবে বাঁচতে হলে জনগণকে এখন স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন জেনে নিয়ে কিভাবে নীরোগ জীবন লাভ করা যায় তার জন্য নিয়মিত চর্চা করতে হবে।

প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমাদের গড়ে তুলতে হবে স্বাস্থ্য সচেতন ও সক্রিয় সামাজিক সংস্থা। অনেক সময় সামান্য একটু সহযোগিতা পেলেই একটি জীবন রক্ষা পেয়ে যায়।

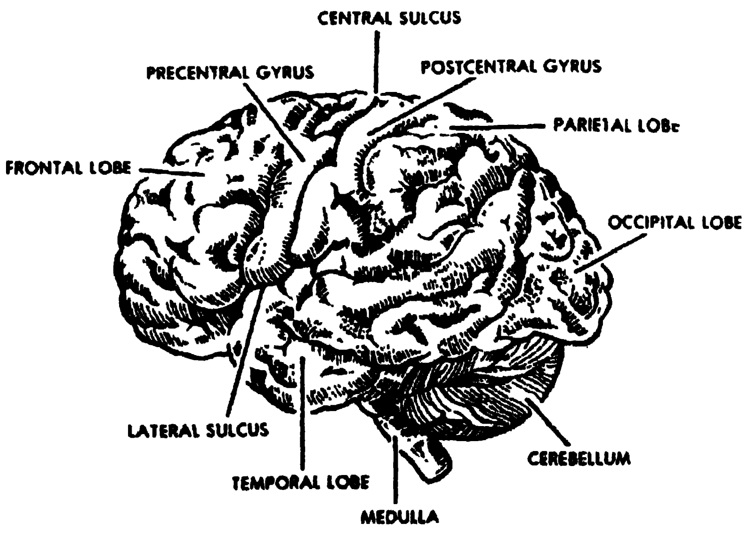
আধুনিক যুগের সমাজ জীবনে বাড়ছে স্বার্থপরতা- কমছে সহযোগিতার মনোভাব। এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও দেখা দিচ্ছে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা এবং কর্তব্যবোধের অভাব। এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজসেবা মূলক আদর্শের ব্যাপক প্রচার এবং আইনগত দায়বদ্ধতা।

বিশ্বায়নের ফলে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলো জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দায়িত্ব গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্যের রূপ নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে।

ভারতের সর্বত্র এখন খাদ্য এবং ঔষধের ব্যাপক ভেজাল বাণিজ্য চলছে প্রায় প্রকাশ্যে এবং অবাধে। এসবের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিকদের সংঘবদ্ধ অরাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

· উন্নত দেশগুলোতে খাদ্য এবং ঔষধে ভেজাল দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। ভারতের বহু রাজ্যে ভেজাল দেবার কারখানা চলছে প্রায় প্রকাশ্যে। মনে হয় এদেশে ভেজাল বাণিজ্য করার অধিকারও একটি গণতান্ত্রিক অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে এই খেলা কি চলতে দেওয়া যায়?

স্বাস্থ্য সচেতনতার দুটি দিক আছে। একটি হল নিজে স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সংযমী ও সচেতন করে তোলা। অন্যটি হল নিজের পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। প্রতিবেশীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। সমস্যাটি শুধু ব্যক্তিগত নয় সামাজিক সমস্যা তো বটেই, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। বেশকিছু রোগ আছে যা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এইডস রোগ এমন একটি রোগ যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে এবং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এইডস রোগীর চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যাবে না, রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই শুধু তা ধরা পড়ে। তাই এখানে জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের চেতনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘ এ বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সচেতনতার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।



মানব মস্তিষ্ক

ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন

ভারতে বৃটিশ শাসকরাই ডাক্তার শব্দটির প্রচলন করেছেন। বৃটেন থেকেই আধুনিক ডাক্তার এবং আধুনিক এলোপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা ভারতে আমদানী করা হয়েছে। এটিই এখন পৃথিবীর সর্বত্র সর্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি।

এর আগে ভারতে আয়ুর্বেদিক বৈদ্য ও কবিরাজদের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুসলমান শাসকরাও নানা ধরনের হেকিমি চিকিৎসা আমদানী করেছিলেন। কিন্তু যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ না থাকায় দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির গবেষণা শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ব্যবহার করে যেসব ঔষধ তৈরী হয় সেগুলো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থাকে। কবিরাজি বড়ির সঙ্গে নানা ধরনের পাতা-শিখর সংগ্রহ করে বেটে বা সেদ্ধ করে সালসা তৈরী করে খাওয়ার জটিলতাও আছে। আজকাল এলোপ্যাথি ঔষধের মতই টেবলেট এবং ক্যাপসূলের আকারে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরী শুরু হয়েছে। ফলে জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

তাছাড়া বিদেশ থেকে আগত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও এদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ হোমিওপ্যাথি ঔষধের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে নানা জটিল প্রশ্ন এবং বিতর্ক হয়েছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়ে নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন। নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার করে এবং চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন বহু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তবে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সুফল পেতে হলে কিছুকাল ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়। অনেক রোগের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করার মত সময় হাতে থাকে না। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ও গবেষণার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানে হাতুড়ে চিকিৎসকের পরিবর্তে সুশিক্ষিত আধুনিক ডাক্তার উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যোগদান করছেন। এখন আর কবিরাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকলেই এখন ডাক্তার। সকলেই আধুনিক চিকিৎসার অংশীদার। সকলেরই সমান মর্যাদা।

এখন গ্রামাঞ্চলেও সুশিক্ষিত ডাক্তারদের চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে হাতুড়ে ডাক্তার বা ঝাড়, ফুঁক, জলপড়ার চিকিৎসার ফাঁকি থেকে জনগণ ক্রমশঃ মুক্ত হচ্ছেন। গ্রামীণ কুসংস্কার অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাই শুধু কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে।

দুর্গম অঞ্চলের যেখানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার প্রসারও ঘটেনি, সেখানে গ্রামীণ ওঝাই এখনো চিকিৎসার একমাত্র সম্বল। এটি কোন একটি রাজ্যের সমস্যা নয়। এটি হল জাতীয় সমস্যা। তাই দেশের প্রতিটি দুর্গম অঞ্চলেও যাতে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য জাতীয় স্তরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ভারতের মত বিশাল দেশে সুচিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক সুশিক্ষিত ডাক্তার প্রয়োজন তা বর্তমানে নেই। যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তাদের একটা বড় অংশ মোটা বেতনের চাকুরী নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। একজন ডাক্তার তৈরী করতে ২০ লক্ষ টাকারও বেশী খরচ হয়। জনগণের অর্থে শিক্ষা লাভ করে জনসেবায় বিমুখ হওয়া, অর্থের নেশায় বুদ হয়ে থাকা, দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ উপলব্ধি না করা আধুনিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। শুধু যে বিত্তবান ঘরের ছেলেমেয়েরাই বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে তা নয়। দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েরাও সরকারী অর্থে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিৎসার অভিজ্ঞতা নিয়ে যারা দেশে ফিরে আসছেন তারাও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকছেন। ডাক্তারী শিক্ষায় জনসেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক মানসিকতা গড়ে তোলার শিক্ষা থাকলেই চলবে না, পেশাগত দায়িত্ববোধের আইনগত বাধ্যবাধকতাও থাকতে হবে।

আধুনিক চিকিৎসায় আরেক সমস্যা হল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা। একজন বিশেষজ্ঞ একটি বা দুটি বিষয়ে চিকিৎসা বিদ্যার বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এবং তিনি শুধু নিজের বিষয়েই চিকিৎসা করবেন। এর ফলে চিকিৎসা পদ্ধতি

উন্নত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাবেন তা নিয়ে জটিল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।

কাজেই কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন তার পরামর্শের জন্য যেকোন একজন সাধারণ ডাক্তারের কাছেই প্রথমে যেতে হবে। সবচেয়ে ভাল কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা সুযোগ থাকলে কোন একটি হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে যাওয়া। তিনিই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে তার পরামর্শ দিতে পারবেন।

সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ দেবার জন্য প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য কর্মী নিযুক্ত করা হচ্ছে। তারাও প্রাথমিক পরামর্শ দিতে পারেন। তাদের পরামর্শ মত ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন, কেন যাবেন তা স্থির করে নেওয়া যেতে পারে।

আজকাল চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতার সুযোগ নিয়ে বহু ধরনের স্বাস্থ্য বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠছে। বহু অসহায় মানুষ অযথা চিকিৎসার নামে সময় এবং অর্থের অপচয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে যেকোন সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের পরামর্শ নেওয়াই উচিত। বেসরকারী নার্সিং হোমে সব রকম চিকিৎসার সুযোগ থাকে না।

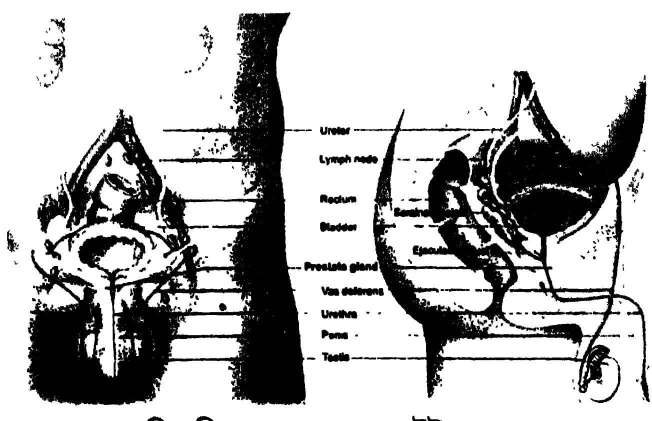
হাসপাতালের রোগীর ভিড়, চিকিৎসকের অভাব, সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাব, জনসেবার পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখার রীতিনীতি কঠোরভাবে পালন করার জন্য সরকারী প্রশাসনকে কঠোর ও বাস্তবমুখী হতে হবে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বহু বনজ ঔষধী গাছ আবিষ্কার করেছে এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসার নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে উপকৃত হয়েছে। ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি এভাবেই প্রচলিত হয়েছে। দ্রব্যগুণের মহিমা আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করছেন।

কিন্তু আধুনিক যুগের জল-বায়ু-মাটি দূষণের ফলে অতি সাধারণ রোগও দ্রুত জটিল আকার ধারণ করে। ফলে ঘরোয়া চিকিৎসার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকা যায় না। সর্দি কাশি ও সাধারণ জ্বর যখন দ্রুত জটিল রূপ নেয় তখনই দেরী না করে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সাধারণ বদহজম থেকে যখন প্রচুর এসিড ও গ্যাস সৃষ্টি হয় তখনও দেরী না করে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

আগে হার্ট ও প্রেসারকে বড়লোকের রোগ মনে করা হত। কিন্তু বর্তমান সমাজের জটিল পরিস্থিতিতে যেকোন ব্যক্তিই হার্টের রোগে বা ব্লাডপ্রেসারের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, হচ্ছেনও। ডায়াবেটিস রোগও এখন সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব রোগের লক্ষণ ধরা পড়লে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। ডাক্তারের পরামর্শ মত নিয়মিত ঔষধ খেতে হবে। একটু ভাল হলেই ঔষধ বন্ধ করে দেওয়া বিপজ্জনক এমনকি প্রাণঘাতিও হতে পারে। খাদ্য এবং জীবনধারাও বদলাতে হবে।

ত্রিপুরা ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে ত্রিপুরাবাসীর জীবন বিপন্ন হয়েছে। তখন চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। এখন ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সহজ হয়েছে। কিন্তু বেশী দেরী করে ফেললে ম্যালেরিয়া রোগ জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করে। তখন চিকিৎসকের কিছু করার থাকে না। প্রতিটি রোগই নানারকম জটিল রূপ নিচ্ছে। কাজেই যেকোন রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাহলেই সুচিকিৎসা পাওয়া যাবে।

কি রোগ হয়েছে, কিভাবে তার প্রতিকার ও চিকিৎসা করতে হবে তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তারই স্থির করবেন। তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। তাতে হিতে বিপরীত ফল হয়। পেট ব্যথা, বুক ব্যথা অনেক কারণেই হতে পারে। অনেক রোগেরই একইরকম উপসর্গ থাকে। সঠিক রোগটি ডাক্তারের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডাক্তারের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত মূল্যবান একথা মনে রাখতে হবে।



কিডনি - ব্লাডার - প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড

মানব দেহের সাধারণ পরিচয়

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভারতীয় দর্শনের মতে আকাশ, বায়ু, মাটি, জল ও অগ্নি এই পঞ্চভূতের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। আবার মৃত্যুর পরে মানব দেহ এই পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় রূপ মানবদেহে বর্তমান।

যা থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বলে প্রকৃতি। মানুষ হল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মানুষের পূর্বপুরুষ হল একশ্রেণীর বানর। সেই বানরগোষ্ঠী একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গেরিলা ও শিম্পাঞ্জী মানুষের কাছাকাছি বন্যপ্রাণী। হাজার হাজার বছর মানুষও বন্যপ্রাণীর মত জীবন-যাপন করেছে।

মানুষ যেদিন হাঁটতে শিখেছে, হাত দিয়ে কাজ করতে শিখেছে, মুখের শব্দকে অর্থবোধক ভাষায় প্রকাশ করে মনের ভাব বিনিময় করতে শিখেছে, পাথর ভেঙ্গে অস্ত্র তৈরী করে শিকার করতে শিখেছে। তখনই মানুষ অন্যসব বন্যপ্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। কৃষি কাজ আবিষ্কারের পর মানুষ স্থায়ী বসতি গড়তে শুরু করেছে। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতা গড়ে তুলেছে।

মানব সভ্যতা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান স্তরে এসেছে। তার মূল শক্তি হল চিন্তাভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। প্রকৃতির নিয়মকে আয়ত্ত করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

এতসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশী ও মস্তিষ্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। মানব দেহে বিশ্বের এক বিস্ময়কর জটিল ও নিখুঁত যন্ত্র বিশেষ। মানবদেহকে অনুকরণ করেই আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছে রোবট।

মানবদেহের লোমকূপ, শিরা, উপশিরা, ধমনী, স্নায়ু, মজ্জা এগুলোকে ভারতীয় চিন্তাবিদরা আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আকাশের মেঘ জলের ধারা বর্ষণ করে জীবন ধারাকে সজীব ও সক্রিয় রাখে।

বায়ু হল দেহের প্রাণশক্তি, প্রাণকোষ ও প্রাণবীজের নির্মাতা। এই বায়ুশক্তিই শরীরের যন্ত্রগুলোকে জীবনরস ও রক্ত সরবরাহে সাহায্য ও পরিচালনা করে।

জল শরীরের যাবতীয় রসপদার্থ রক্ত, শুক্র ইত্যাদি তরল পদার্থ সৃষ্টি ও পরিচালনা করে। মাটি থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপকরণ সৃষ্টি হয়। এসব উপাদান থেকে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ সৃষ্টি হয়।

অগ্নি হল মানবদেহের শক্তি ও বল। দেহের জঠরাগ্নি খাদ্যবস্তু জীর্ণ করে রস ও রক্ত উৎপন্ন করে, দেহের তাপ রক্ষা করে এবং জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে।

ভারতীয় চিন্তাবিদ ঋষিরা বহু প্রাচীনকালেই মানুষের দেহ ও মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মধারার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা ভারতীয় চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করতে পারছেন না।

ভারতীয় চিন্তাবিদদের বিশ্লেষণ আধুনিক বিজ্ঞানের কাছাকাছি। ভারতীয় পণ্ডিতরা যেটাকে গ্রন্থি বলেছেন ইংরেজীতে তার নাম হল গ্ল্যাণ্ড।

শরীরের প্রধান গ্রন্থিগুলোর অন্তর্মুখী রসের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা মানব মন তৈরী হয় এবং সৃষ্টি হয় মানসিক জগৎ। মনের শৃঙ্খলা নষ্ট হলে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়।

বায়ু যেমন মানবদেহের প্রধান রক্ষক এবং পরিচালক তেমনি বায়ুর প্রধান কর্মকেন্দ্র হল ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র। দেহের সব যন্ত্রের বিশ্রামের সুযোগ আছে কিন্তু ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের বিশ্রামের সুযোগ নেই। এ দুটি যন্ত্র ক্ষণিক বিশ্রাম নিলেই মৃত্যু অবধারিত। বায়ুগ্রন্থি সুস্থ ও সবল থাকলে শরীরের অন্যান্য গ্রন্থি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে।

অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ যকৃত, প্লীহা, অগ্নাশয়, পাকস্থলী যারা আমাদের খাদ্যবস্তুকে দগ্ধ ও জারিত করে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা তৈরী করে জীবনী শক্তিকে রক্ষা ও পরিচালনা করে। এগুলো ইংরেজীতে লিভার, স্পিন, প্যানক্রিয়াস ও স্টমাক নামে পরিচিত।

এরপরেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডগুলো হল, মূত্রগ্রন্থি (কিডনী), পিতৃগ্রন্থি (টেসটিস), মাতৃগ্রন্থি (ওভারী) কন্দর্পগ্রন্থি (প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড) ইত্যাদি।

অহংগ্রন্থি (পিট্যুইটারী গ্ল্যাণ্ড) দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, স্মৃতিশক্তি পরিচালনা করে। এই গ্রন্থি সুশৃঙ্খলভাবে চালু থাকলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে মানুষের শরীর গঠনে জল, বায়ু এবং অগ্নির প্রাধান্য রয়েছে। ফলে শরীরের কার্যকলাপ নির্ভর করে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি বস্তুর ক্রিয়াকলাপের উপর।

বায়ু শরীরের অভ্যন্তরে জীর্ন খাদ্যের সার ও অসার বস্তু পৃথক করে বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে মল ও মূত্ররূপে শরীর থেকে বের করে দেয়। সারবস্তুকে বায়ু রক্ত ও শক্তি রসে পরিণত করতে সাহায্য করে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। বায়ুর সাহায্যে মানুষ কথা বলে, গান গায়, বিভিন্ন শব্দ করে, মস্তিষ্কের রক্ত প্রেরণ করাও বায়ুর কাজ। এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ এবং দূষিত বায়ুর বর্জনের কাজটি সম্পন্ন হয়। এ কাজটি করে ফুসফুস।

বায়ুর পরেই পিত্তের স্থান। শরীর গঠনকারী অগ্নিরসকেই পিত্ত বলে। বিশুদ্ধ পিত্তরস শরীরে শক্তি ও বল যোগায়, শরীরের তাপ রক্ষা করে। দৃষ্টিশক্তি বাজায় রাখে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জাগ্রত করে, মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। দেহের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের পিত্তরস সৃষ্টি হয়।

শরীর গঠনে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনায় কফ, বা শ্লেষ্মার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের সারভাগ থেকেই সৃষ্টি হয় শ্লেষ্মা বা কফ। রক্তবাহী ধমনী ও শিরায় রক্তের সারভাগ রস ধাতুকে বহন করে নিয়ে যায় শ্লেষ্মা বা কফ। এই শ্লেষ্মা বা কফ বিশেষভাবে দগ্ধ হয়ে লবণ রসে পরিণত এবং এই লবণ রস রক্তকে ক্ষারধর্মী করে। লবণ রস কমে গেলে শরীর অসুস্থ ও দুর্বল হয়। শ্লেষ্মা বা কফের অভাব হলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নড়াচাড়া করতে পারে না। দেহের প্রতিটি অস্থিসন্ধিতে এই শ্লেষ্মা বা কফ প্রবাহিত হয়।

মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের গ্রন্থিগুলোর রস উৎপাদন করার ক্ষমতা কমে যায়। নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে শরীরের গ্রন্থিরস উৎপাদনের ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে রাখা যায়। অবশ্য খাদ্য নির্বাচনেও সতর্কতা প্রয়োজন হয়। শরীরে খাদ্যদ্রব্য হজম না হলে মল মূত্র জমে দূষিত হয়। শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় এবং নানারকম রোগের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেন। কিন্তু রোগের আক্রমণ তীব্র না হওয়া পর্যন্ত সংযমী হতে পারেন না। এই সময়ে যেকোন রোগই জটিল রূপ নিতে থাকে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই সংশোধনের বা প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না।

প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রেই ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ, পথ্য, খাদ্য ও জীবন ধারা অনুসরণ করতে হবে। ধূমপান, মদ্যপান, মাদকাসক্তি এবং অতিভোজন, অনিয়ম ত্যাগ করে সংযমী জীবন যাপনের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয় ও কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। দেহযন্ত্রের প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করার ফলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে। এখন বিজ্ঞান গবেষণা কোন একটা দেশ বা মহাদেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই হাজার হাজার বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। ফলে চিকিৎসা জগতেও দ্রুত পরিবর্তনের ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিদিনই পুরানো ধারণা এবং পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। পীড়িত মানুষের মনে আশার আলো ফুটে উঠছে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে, মানুষের শরীর ২০৬টি হাড় দিয়ে গঠিত হয়েছে। অনেকে বলছেন হাড়ের সংখ্যা ২১২টি। হাড়গুলো দিয়ে দেহের যে গঠন তাকে বলা হয় কংকাল। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সুরক্ষিত রাখা, চলাচল ও নড়াচড়ায় সাহায্য করা কংকালের প্রধান কাজ। প্রত্যেকটি হাড় শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী সুগঠিত।

মানুষের মেরুদণ্ড ৩৩টি হাড় দিয়ে গঠিত। হার্ট এবং ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ১২ জোড়া হাড় রয়েছে। মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকে ২২টি হাড়ের দ্বারা। মুখে আছে ১৪টি হাড়। হাতে আছে ১ জোড়া উর্ধ্ব বাহু এবং এক জোড়া নিম্ন বাহু। পা এবং মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে আছে শ্রেণীচক্রের হাড়গুলো। মানুষের নখ এবং চুলও কংকাল তন্ত্রের অন্তর্গত। মানবদেহের এই নিখুঁত ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান।

মানবদেহে প্রত্যেকটি কাজের বিশেষ বিশেষ ধারাকে এক একটি তন্ত্রে বা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (১) পরিপাক তন্ত্র (২) রক্ত সংবহন তন্ত্র (৩) শসন তন্ত্র (৪) রেচন তন্ত্র (৫) স্নায়ুতন্ত্র (৬) জনন তন্ত্র (৭) অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (৮) কংকাল তন্ত্র (৯) ত্বক (১০) গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদি।

পরিপাক তন্ত্র

পরিপাক তন্ত্রের কাজ হল খাদ্যগ্রহণ, ও খাদ্যের সার বস্তু গ্রহণ করে অসার বস্তু দেহ থেকে বের করে দেওয়া। মানুষের মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত ঠোঁট, জিভ, দাঁত, তালু, খাদ্যনালী, পাকস্থলী (স্টমাক), বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্র (ইনটেস্টাইন) ইত্যাদি পরিপাক তন্ত্রের অন্তর্গত।

রক্ত সংবহন তন্ত্র

শরীরের বিভিন্ন কোষে রক্ত, অক্সিজেন ও হরমোন বহন করে নিয়ে যাওয়া হল এই তন্ত্রের কাজ। এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল হার্ট। প্রতিদিন মানবদেহের এক লক্ষ কিলোমিটার শিরা, উপশিরা ও ধমনীর মাধ্যমে ২৮ হাজার লিটার রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে পাঠায় হার্ট। মানুষের শরীরে প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার নির্দিষ্ট ছন্দে সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ এবং সরবরাহের কাজ করে হার্ট। এই নির্দিষ্ট ছন্দে পতন ঘটলেই হার্টের অসুখ ধরা পড়ে।

শ্বসন তন্ত্র

নাকের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলে এই তন্ত্রের মাধ্যমে। নাক, মুখ, ল্যারিংকস এবং ফুসফুস পর্যন্ত এই তন্ত্রের কাজ বিস্তৃত। হার্টের দু'পাশে দুটি ফুসফুস থাকে। একটি বড়, একটি ছোট। ফুসফুসের ডানদিকে তিনটি ভাগ অর বামদিকে ২টি ভাগ। শ্বাসকার্যের ফলে বিশুদ্ধ অক্সিজেন রক্তে মিশে যায় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। মানুষের জন্য অক্সিজেন যেমন প্রয়োজন, উদ্ভিদ ও গাছ গাছড়ার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড তেমনি প্রয়োজন। এভাবেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পায়।

রেচন তন্ত্র

শরীরের দূষিত রক্ত শিরার মাধ্যমে একজোড়া কিডনীতে প্রবেশ করে। কিডনী দূষিত রক্ত থেকে দূষিত পদার্থ মূত্রাশয়ের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়। এভাবে শরীরের রক্তকে বিশুদ্ধ রাখাই রেচনতন্ত্রের প্রধান কাজ।

স্নায়ুতন্ত্র

প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা ঘটনায় মানুষের শরীর যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শরীর ও মনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে স্নায়ুতন্ত্র।

জননতন্ত্র

পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে কিছুটা পৃথক। শুক্রাশয়, শুক্রথলি, শুক্রনালি, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড নিয়ে পুরুষের জননতন্ত্র গঠিত। নারীর ক্ষেত্রে জরায়ু এবং দুটি ওভারী নিয়ে গঠিত হয় জনন তন্ত্র। নতুন মানুষের জন্মদানই এই জননতন্ত্রের প্রধান কাজ।

অন্তঃক্ষরা তন্ত্র

শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনের সাহায্যে কোষ বিভাজন ও বিপাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা এই তন্ত্রের প্রধান কাজ।

কংকাল তন্ত্র

মানব শরীরকে সচল ও সজীব রাখা কংকাল তন্ত্রের প্রধান কাজ।

ত্বক ও গ্ল্যাণ্ড

মানুষের ত্বক ও এণ্ড্রোক্রিন গ্ল্যাণ্ড মানব শরীরের সুরক্ষা ও জীবনীশক্তির দুটি গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্র। মোট ১০টি তন্ত্রে মানবদেহকে বিজ্ঞানীরা ভাগ করেছেন।

মানুষের জন্ম হয় একটি মাত্র কোষ থেকে। কিন্তু কোষ বিভাজনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নতুন কোষ সৃষ্টি হয় এবং মানব শরীরের যাবতীয় গঠনকর্ম সম্পন্ন হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান মানব শরীরের ক্ষুদ্রতম কণিকার কার্যকলাপ যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করছে তা প্রাচীন ও মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ছাড়া এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের আয়ু সম্পর্কেও গভীর গবেষণা চালিয়েছে। দেখা গেছে অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষ সরল জীবনযাপন ও সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করেও দীর্ঘ জীবন লাভ করছে। আবার সবরকম নিয়ম মেনে চললেও বিত্তবান ব্যক্তিরও অকাল মৃত্যু ঘটছে। এক্ষেত্রে মানুষের জন্মগত জিনের প্রভাব আছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাচীনকালে মানুষের আয়ু ছিল কম। স্বাস্থ্য সচেতনতা না থাকায় এবং সুচিকিৎসার সুযোগ না থাকায় মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার অনেক কমেছে।

মানবদেহের জিন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা চলছে। অদূর ভবিষ্যতে জিন বিজ্ঞান চিকিৎসা জগতে একটা বড় ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করবে। মানুষের

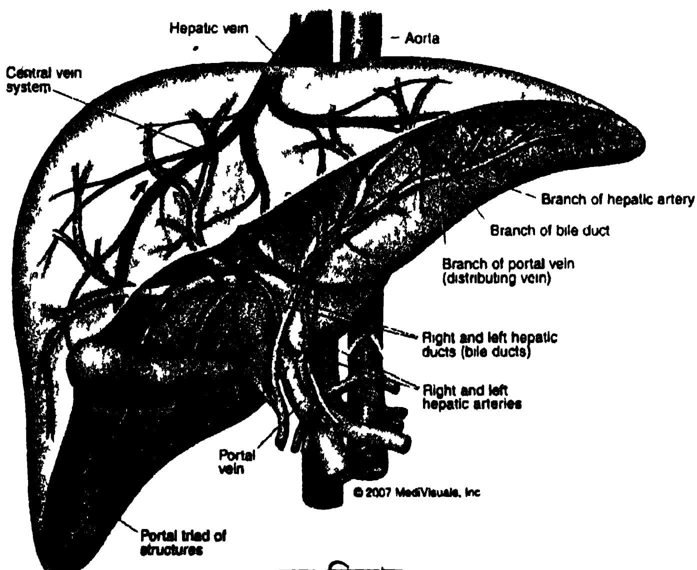
জীবনধারা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার অসীম ক্ষমতা থাকবে জিন চিকিৎসায়।

খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কেও আধুনিক গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষের শরীর গঠন ও সুরক্ষার জন্য কি ধরনের খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন এবং কি ধরনের খাদ্য বর্জন করা দরকার তা এখন চিহ্নিত করে দিতে পারে পুষ্টি বিজ্ঞান। প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা প্রতিদিনই আরো উন্নত হচ্ছে।

প্রোটিন হল শরীর গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাংসপেশী গঠন এবং খাদ্য পরিপাক ও ক্ষতিকর পদার্থ বিনষ্টকারী এন্টিবডি তৈরীর প্রধান উপাদান হল প্রোটিন। এই প্রোটিন কোন কোন খাদ্যবস্তুতে রয়েছে তাও চিহ্নিত করা হয়েছে পুষ্টি বিজ্ঞানে।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহযন্ত্রের প্রতিটি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এখন অনেক বেশী নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য। প্রতিদিনই গবেষকরা নতুন তথ্য আবিষ্কার করে এই জ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করছেন।

মানুষ বা অন্যকোন প্রাণীই অমর নয়। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা প্রকৃতির রাজ্যে সুখী ও নীরোগ জীবনের উপায় আবিষ্কার করে দীর্ঘ জীবনভোগ করার পথ সৃষ্টি করে চলেছে।



সুস্থ লিভার

শিশুর যত্ন মায়ের যত্ন

মানব সমাজে পরিবার হল সভ্যতার প্রথম সন্তান। পরিবার গঠনের আগে মানুষ ছিল বর্বর অবস্থায়। আঞ্চলিক ভেদে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, খাদ্যরীতি ও সামাজিক রীতিনীতি পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে বিচিত্র ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও পারিবারিক রীতিনীতি স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালবাসায় একটা মৌলিক ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

মাতা-পিতা ও সন্তান নিয়ে একেকটি পরিবার গড়ে উঠে। পরিবারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নবজাত সন্তান। শিশুর জীবনকে নিয়েই শুরু হয় মাতা-পিতার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও পরিকল্পনা।

মায়ের পেটে শিশুর আবির্ভাবের সময় থেকেই মায়ের যত্ন শুরু করতে হয়। এ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং অবহেলার কারণে বহু মানুষের প্রসবকালীন অকাল মৃত্যু ঘটে। একই কারণে জন্মলগ্নেই বহু শিশুর মৃত্যু ঘটে। অপুষ্টিজনিত কারণেই এ ধরনের মৃত্যু ঘটে। বিশ্বের সব দেশেই এই সমস্যা আছে। সমাধানের দায়িত্ব সমাজ এবং দেশের সরকারকেই নিতে হয়। পরাধীন দেশগুলোতেই এতকাল যাবৎ প্রসূতি মা ও শিশুর মৃত্যুর হার ব্যাপক ছিল।

এখন পৃথিবীর কোন দেশই আর পরাধীন নয়। সব স্বাধীন দেশের সরকারই এই সমস্যাটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে এ ধরনের মৃত্যুহার সব দেশেই কমছে। তবে আর্থিক কারণে দরিদ্র পরিবারগুলোতে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা সব সদস্য রাষ্ট্রকেই এ বিষয়ে যত্নবান হতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

গর্ভধারিণী মায়ের সুস্থ দেহ ও মনের উপর সুস্থ ও নীরোগ সন্তান লাভ অনেকটাই নির্ভর করে। মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে মায়ের দেহ ও মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রসূতির খাদ্য, পানীয় এবং শারীরিক ও মানসিক যত্নের উপর সুস্থ সন্তান লাভ পুরোপুরি নির্ভরশীল। গর্ভকালীন অসুখ বিসুখ সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া পরিবারের প্রাথমিক দায়িত্ব।

আমাদের দেশে গ্রামে এবং শহরের কিছু কিছু পরিবারেও নানা ধরনের

সংস্কার ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে যা প্রসূতির দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার পক্ষে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের প্রভাবতো এখনো সমাজের বড় একটা অংশকেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ এসব বাধা দূর করতে সহায়ক হতে পারে।

গর্ভবতী মায়ের যত্নের ব্যাপারে বিশেষভাবে কতকগুলো বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন-

(১) গর্ভকালীন সময়ে মাঝে মাঝে প্রসূতি অসুস্থ হতে পারে। সময় মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত বমি, এসিডিটি, গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির প্রতিকার না করলে প্রসূতি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলতে হবে।

(৩) শরীরে ভিটামিনের অভাব হলে মুখে ঘা, মাড়ী ফুলে যাওয়া, দাঁত থেকে রক্ত ঝরা এরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন খাওয়াতে হবে।

(৪) ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেতে পারে, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

(৫) রক্তশূন্যতা বা হার্টের কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শমত ঔষধ ও খাদ্য খেতে হবে।

(৬) অতিরিক্ত সাদাস্রাব, চুলকানি, পেট ব্যথা, পেট শক্ত হয়ে উঠা, গর্ভস্থ সন্তানের নড়াচড়া কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তার দেখাতে হবে এবং পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

(৭) যেকোন ধরনের জ্বর হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অতিরিক্ত জ্বর সন্তানের মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

(৮) হলুদ প্রস্রাব হলে এবং চোখ হলুদ হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে।

(৯) প্রসূতি যদি কম বয়সের বা বেশী বয়সের হয় তবে মাঝে মাঝে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে।

(১০) প্রসূতির স্বাস্থ্য যদি দুর্বল হয় বা হার্টের বা অন্য কোন জটিল রোগে

আক্রান্ত হয় তবে প্রসবকালীন সময়ে মাঝে মাঝে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

(১১) ধনুষ্টংকার মা এবং শিশুর পক্ষে প্রাণঘাতি রোগ। গর্ভধারণের ৫/৬ মাস পর একটি ইনজেকশন এবং তার দেড় মাস পর একটি ইনজেকশন নিলে এই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

গর্ভকালীন অবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ মত চলতে হবে। গ্রামের বয়স্ক নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মহিলাদের কোন পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

বর্তমানে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও প্রসূতি পরিষেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। ভিটামিন টেবলেট এবং পুষ্টিকর খাদ্যও বিনামূল্যে পাওয়া যায়। রক্ত ও প্রস্রাবের পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসূতির পরিবারকে এসব সুযোগ সুবিধা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি ও বৃদ্ধি মায়ের উপরই নির্ভরশীল। মা ও শিশুর কল্যাণের জন্যই মায়ের খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। প্রসূতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সময় মত খাচ্ছে কি না এবং নিয়মিত হজম করতে পারছে কিনা তা পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রসূতির খাদ্য হবে সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর। গর্ভের শেষ তিন মাসে শিশুর বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এই সময় প্রসূতির খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গর্ভধারণের আগে যেরূপ খেতেন তার চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী খেতে হবে গর্ভাবস্থায়। হজম শক্তি অনুযায়ী খাদ্য দিতে হবে। অতিরিক্ত খাবার খেয়ে পেটের অসুখ হলে ক্ষতি হবে। খাবার একসঙ্গে বেশী না খেয়ে বারবার খাওয়া উচিত। পানীয় জলও একটু বেশী পরিমাণে খেতে হবে। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

এদেশে গ্রামাঞ্চলে নিজ বাড়ীতে ধাত্রী ডেকে এনে নিজ বাড়ীতে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হতো। গ্রাম্য ধাত্রীর অজ্ঞতা ও অসতর্কতার কারণে আঁতুড় ঘরেই অনেক প্রসূতি ও নবজাত শিশুর মৃত্যু হতো। বর্তমানে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাগালের মধ্যে থাকায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। হাসপাতাল হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা আছে সেখানেই প্রসবের স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। কোনরকম জটিলতা থাকলে বড় হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা করাই নিরাপদ। প্রসবের স্থান নির্বাচন করে প্রসবের

একমাস আগেই কয়েকবার ডাক্তার দেখাতে হবে, যেকোন জটিলতা দেখা দিলে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রসব স্থানে প্রসূতির নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে রাখতে হবে। প্রসব ব্যথা শুরু হবার পর অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে প্রসব স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। যোগাযোগের সমস্যা থাকলে আগেই ভর্তি করিয়ে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অল্প ভুলের জন্য যাতে একটি জীবন নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রসবের পর মা এবং শিশু উভয়ের যত্ন নেওয়া জরুরী। সতর্ক না থাকলে মায়ের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে এমনকি একবার অবনতি ঘটলে ভবিষ্যতে আর কোন দিন স্বাস্থ্য ঠিক হবে না এরকম অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে।

নবজাত শিশুর একমাত্র খাদ্য হবে মায়ের দুধ। সন্তানের জন্যই মায়ের বুকে দুধ সৃষ্টি হয়। এই দুধ শিশুর শরীরে পুষ্টি এবং প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করে। এই সময় মায়ের বুকে দুধ বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও ফল খাওয়াতে হবে। নতুবা অপুষ্টিজনিত কারণে মা ও শিশু উভয়েরই ক্ষতি হবে। কম খরচের সহজপাচ্য খাদ্যের মধ্যে দুধ ও সাগু সেদ্ধ করে দুবেলা খাওয়ানো যেতে পারে। পানীয় জলের পরিমাণ এই সময় একটু বেশী থাকা দরকার।

শিশুর যত্নের ভার মাকেই বেশী বহন করতে হয়। মায়ের বিশ্রামের সময় কমে যায়। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সময় স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন।

গ্রামাঞ্চলে সন্তান প্রসবের প্রথম মাসটিকে অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়। প্রসবের জন্য বাড়ীর এক কোণে নোংরা পরিবেশে একটি ঘর তৈরী করে প্রসূতি ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং একমাস এই নোংরা অস্বাস্থ্যকর ঘরে মা ও শিশুকে থাকতে বাধ্য করা হয়। অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার থেকেই এরূপ ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। নবজাত শিশু একটি পবিত্র নিষ্পাপ মন নিয়ে জন্মায়। তার জন্মকে অপবিত্র গণ্য করা সামাজিক অপরাধ। বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে শিশু ও প্রসূতিকে আলাদা রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন ও সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর একটি ঘরকে প্রসূতি গৃহরূপে ব্যবহার করা উচিত।

শিশুর জন্ম হবার পর মা ও শিশুর নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। তা সামাল দেওয়া একজন সুশিক্ষিত ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব। তাই শিশুর জন্ম

হাসপাতালেই হওয়া উচিত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সরা যেভাবে মা ও শিশুর যত্ন নেন বাড়ীতে তা সম্ভব নয়। সামান্য ভুলে বা সামান্য ত্রুটিতেই মা অথবা শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে। শিশু মায়ের পেটে যেরকম পরিবেশে ও আরামে থাকে, জন্মের পর সে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে প্রবেশ করে। চারদিকে থাকে নানারকমের জীবাণু। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। নতুন পরিবেশে শিশুর যত্ন নেবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সরাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া হাসপাতালে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে মা ও শিশু নিরাপদে থাকে।

জন্মের পরই শিশুকে একটি পরিষ্কার পাত্রে রেখে ধীরে ধীরে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রেখে মুখ গলা ও নাক থেকে শ্লেষ্মা বের করে দিতে হয়। তারপর পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে শরীর মুখ পরিষ্কার করে দিতে হয়। এসব কাজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স দিয়ে করানো উচিত। জন্মের পর ৪৮ ঘন্টা শিশু পায়খানা প্রস্রাব করে কিনা নজর রাখতে হয়। শিশুর প্রথম পায়খানা হয় কালো রঙের। সাধারণতঃ ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিশু পায়খানা করে।

জন্মের পর শিশুর শরীরে ত্বকের রোগ প্রতিরোধকারী একটি তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ক্রমে ক্রমে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তৈলাক্ত পদার্থ শুকিয়ে যায়।

জন্মের পর শিশুর মুখ একটু ফোলা থাকে, চোখ হলুদ হওয়া, পেছনে নীলাভ দাগ, সারা শরীরে লোমশ ভাব থাকতে পারে। ঘামাচিও দেখা দিতে পারে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জন্মের সময় শিশুর চোখ বন্ধ থাকে। খাবার সময় চোখ খোলা থাকে। চোখের মণি এবং সাদা অংশের রং যদি ঠিক না থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

শিশুর নাকের ছিদ্র শ্লেষ্মায় বন্ধ থাকলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। খাওয়ার সময় কান্নাকাটি করে। নাকের ছিদ্র পরিষ্কার করে দিলেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। অনেক সময় শিশুর জন্মকালে দাঁত দেখা যায়। এনিযে কোনরকম কুসংস্কার বিশ্বাস করা ঠিক নয়। এসব দাঁত কয়েক মাসের মধ্যেই ঝরে যায়।

জন্মের পর শিশুকন্যার স্তনের বৃন্ত ফোলা থাকে। যোনিদ্বারে সাদা স্রাব বা রক্ত পড়ে। অল্পদিনেরই মধ্যেই এগুলো স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অনেক সময় শিশুর দুটি পা ভেতরের দিকে বাঁকানো থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই তা ঠিক হয়ে যায়। তবে দুবছরের মধ্যে স্বাভাবিক না হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

জন্মের সময় শিশুর ওজন সাধারণতঃ আড়াই কেজি থেকে তিন কেজির মধ্যে থাকে। এর চেয়ে কম ওজন হলে তাকে অপরিণত শিশু বলা হয়। এরূপ শিশুর জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। কারণ এরূপ শিশু খুব দুর্বল থাকে, কান্নাকাটি কম করে, দুধ খেতে কষ্ট হয়, পাকস্থলী ছোট থাকে, শরীরের প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টি করতে পারে না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম হলে বা মায়ের অপুষ্টিজনিত কারণেই অপরিণত অবস্থায় শিশুর জন্ম হলে শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে হয়। শীতের দিনে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। শুধুমাত্র মায়ের দুধ বারে বারে খাওয়াতে হবে। মায়ের বুকে দুধ কম থাকলে গরুর দুধ চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। অন্ততঃ ২ কেজি ওজন না হওয়া পর্যন্ত এরূপ শিশুকে স্নান করানো উচিত নয়।

নবজাত শিশুকে বাইরের লোকের কোলে না দেওয়াই উচিত। চামড়া খুব পাতলা থাকে বলে যেকোন রোগ জীবাণু সহজেই শিশুর শরীরে ঢুকতে পারে। চোখে এবং মুখে রোগ জীবাণু ঢুকলে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা তা আটকাতে পারে না। শিশুর শ্বাসনালী কর্মক্ষম হতে সময় লাগে। তাই রোগ জীবাণু সহজেই ফুসফুসে চলে যেতে পারে।

সুস্থ শিশুকে গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন এবং শীতকালে সপ্তাহে ২দিন ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাতে হবে। নাভি শুকিয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্নান করানো যাবে না। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে নিতে হবে। শিশুর নরম শরীর অতি যত্ন করে সাবধানে ধরতে হবে যাতে কোথাও চাপ না পড়ে। স্নানের পর নরম তোয়ালে দিয়ে মাথা ও শরীর ভাল করে মুছে দিতে হবে।

শিশুর নাক ও কানে যাতে জল না ঢুকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। স্নানের সময় কানে তুলো দেওয়া যেতে পারে। কানের ভিতর তেল দেওয়া উচিত নয়। কোন কাঠি দিয়ে কানের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। শুধু তুলো দিয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে। কানের কাছে জোরে শব্দ করলে শিশুর শ্রবণ শক্তির ক্ষতি হবে।

শিশুর চোখ মুখ পরিষ্কার জল দিয়ে যত্ন করে ধুয়ে দিতে হবে। ধুলাবালি, ধোঁয়া ও সূর্যকিরণ থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। নোংরা আঙ্গুল দিয়ে যাতে চোখ • ঘষে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চোখে আঘাত লাগতে পারে এমন

কোন খেলনা শিশুর হাতে দেওয়া যাবে না। অন্য কেউ যাতে এ ধরনের খেলনা নিয়ে শিশুকে আদর না করে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সব শিশুরই মাথায় চুল কম থাকে। চুল ও মাথা পরিষ্কার না রাখলে খুসকি জমে মাথায় ঘা হতে পারে। অনেক সময় গলার গ্ল্যাণ্ড ফুলে যায়। শিশুর মাথায় তৈল দিয়ে দিনে ৩/৪বার চিরুনী দিয়ে মাথা আচড়ে দেওয়া উচিত।

শিশুর জিহ্বা পরিষ্কার রাখার জন্য বেশী ঘষাঘষি করার দরকার নেই। পরিষ্কার নরম কাপড়ে একটু মধু দিয়ে জিহ্বা ও মুখ পরিষ্কার করা যেতে পারে। খাওয়ার পর মুখে একটু জল দিলে শিশু তা গিলবে। অথবা ফেলে দেবে। এতেই চলবে। মায়ের গর্ভে শিশু নাভিগ্রন্থির মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অসার পদার্থ বের করে দেয়। শিশু জন্মের পরই নাভিগ্রন্থি থেকে মা ও শিশুকে আলাদা করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই নাভিগ্রন্থির অংশটি শিশুর শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই সময়ে যাতে জীবাণুর আক্রমণ না হয় সেজন্য নাভির যত্ন নিতে হয়। স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক পাউডার ছড়িয়ে দিতে হয়। নাভি থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

জন্মের পরই শিশুর নখ বাড়তে থাকে। এই নখের আচড়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতি হতে পারে। মলমূত্র নখের মধ্যে লেগে মুখে চলে গেলে নানারকম অসুখবিসুখের সৃষ্টি হতে পারে। নেইল কাটার দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় নখ কেটে দেওয়া উচিত।

স্নানের পর শিশুর শরীরে পাউডার ছিটিয়ে না দিয়ে হাতে পাউডার নিয়ে যত্ন করে শরীরে পাউডার লাগিয়ে দিতে হবে। নাকে পাউডার ঢুকলে হাঁচি, কাশি, সর্দি দেখা দিতে পারে। শীতের সময় শিশুর শরীরে তেল মাখিয়ে কিছুক্ষণ রোদে রাখলে খুব উপকার পাওয়া যায়। সূর্য কিরণ থেকে দেহে ভিটামিন ডি তৈরী হয়। শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন ডি খুবই প্রয়োজনীয়।

শিশুর পোশাক

শিশুর পোশাক গরমের সময় সূতির এবং শীতের সময় উলের হওয়া দরকার। পোশাক হতে হবে সরল ভাজহীন পিঠের দিকে বা সামনের দিকে সহজে খোলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। রাবার সিটে কাঁথা বা তোয়ালে দিয়ে শিশুকে রাখতে হবে। সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। পায়খানা প্রস্রাবের কাঁথা কাপড় সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে শিশুকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

শিশুর খাদ্য

শিশুর জন্মের পর মায়ের দুধই শ্রেষ্ঠ খাদ্য। মায়ের বুক গরম জলে তুলো দিয়ে ভিজিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের দুধে কোন রোগ জীবাণু থাকে না। যখন খুশী খাওয়ানো যায়, গরম করার দরকার হয় না। মায়ের দুধে রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে যার ফলে, সর্দি, কাশি, হাম, পেট খারাপ ইত্যাদি থেকে শিশু রক্ষা পায়। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়েরও উপকার হয়। স্তনের ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জরায়ু তাড়াতাড়ি সঠিক অবস্থায় ফিরে আসে। মা যদি কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হন তখন বিকল্প হিসেবে গরুর দুধ খাওয়ানো উচিত। দুধ খাওয়ার সময় শিশুর পেটে বাতাস ঢুকে। শিশুকে কাঁধে নিয়ে পিঠে চাপ দিলে ঢেকুর উঠে পেটের বাতাস বেরিয়ে যায়। শিশুকে ডানদিকে কাত করে শোয়ালে হজমে সাহায্য হয়। জন্মের পর শিশু বেশ কিছুদিন দিন ও রাত্রির পার্থক্য বুঝে না। তাই গভীর রাতেও খাবার জন্য কান্নাকাটি করে। ক্ষিধে পেলে শিশুকে দুধ দিতেই হবে। উপযুক্ত পরিমাণে দুধ খেতে পেলে শিশু তিন ঘন্টা শান্তভাবে ঘুমিয়ে থাকে। ক্ষিদে পেলেই জেগে উঠে কান্নাকাটি করে।

একমাস বয়স হলে অল্প অল্প ফলের রস শিশুকে খাওয়ানো দরকার। একটু জল ও চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে খাওয়াতে হবে।

তিন মাস বয়স থেকে শিশুকে শক্ত খাবার দেওয়া যেতে পারে। চাউলের গুঁড়ো, বার্লি, সাগু, সুজি দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিনে একবার এবং রাতে একবার খাওয়ানো যেতে পারে। চার-পাঁচ মাস বয়স হলে শক্ত খাবারের সঙ্গে পাকা কলা দেওয়া যায়। রুচি বদলের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফলের রস খাওয়ানো দরকার। ছয় মাস বয়সে ডিমের কুসুম এবং এক বছর বয়সে একটা পুরো ডিম সেদ্ধ করে খাওয়ানো যেতে পারে। আলু সেদ্ধ করে খাওয়ানো যায়। শাকসব্জি সেদ্ধ করে শক্ত খাবারের সঙ্গে খাওয়ানো যায়। অন্নপ্রাশনের পরই ভাত ও রুটি দেওয়া উচিত।

গরুর দুধ বা কৌটার দুধ খাওয়াবার জন্য সোজা বোতলই ব্যবহার করা উচিত। তাহলে সহজে পরিষ্কার করা যাবে। নিপল এবং বোতল কিছুক্ষণ গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। ছয় সাত মাস বয়স হলে কাপে বা গ্লাসে শিশুকে দুধ খেতে অভ্যস্ত করে তোলা দরকার। দুধের তাপমাত্রা দেখে শিশুর গ্রহণযোগ্য

করে দিতে হবে। শিশুদের পাকস্থলী ছোট থাকে। সেজন্য একসঙ্গে বেশী খাবার না দিয়ে বারে বারে খাবার দিতে হবে। শিশুকে কখনো জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়। খাবার আগ্রহ অনুযায়ী খাবার দিতে হবে।

শিশুর শরীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও উপযুক্ত খাবার দরকার হয়।

শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই বড়দের মত খাবার দাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আজকাল তো আড়াই বছর বয়সেই শিশুরা স্কুলে ভর্তি হয়। প্রোটিন, চর্বি, শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও শরীরের বৃদ্ধি ও সুরক্ষার পথ সুগম করে। প্রতিটি পরিবারেই শিশুর জন্ম হয়। একটি শিশুকে কেন্দ্র করেই মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য চেতনার বিকাশ ঘটে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের প্রতি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন নেবার আয়োজন করে।

শিশুর খাদ্যে পানীয় জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ পানীয় জল শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় অবশ্যই প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জল সর্বত্র পাওয়া যায় না। জল ফিল্টারে পরিশোধিত করে ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়াতে হবে।

আমাদের দেশে জলের মাধ্যমে নানা রকমের রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে। তাই শিশুর পানীয় জল সর্বদাই ফুটিয়ে খাওয়াতে হবে। অবশ্য বড়দের জন্যও বিশুদ্ধ পানীয় জল একান্তই প্রয়োজন।

পুকুর, পাতকূয়া, নদী ও ছড়ার জল সরাসরি খাওয়া উচিত নয়। বাজারে হেলোজেন টেবলেট কিনতে পাওয়া যায়। পরিমাণমত টেবলেট ব্যবহার করলে জল শোধিত হয়।

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দুধ, মুড়ি, বিস্কুট, ভাত, ডাল, মাছ, সব্জি, ডিম, মাংস পরিমাণমত খাওয়াতে হবে। ফাস্ট ফুড যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে।

শিশুর টিকা প্রদান

ভারতে এখনো শিশু মৃত্যুর হার বেশী। শিশুদের বিভিন্ন রোগের উন্নত প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকশন আজকাল অনেকটা সুলভ হয়েছে। সময়মত টিকা ও ইনজেকশন নিলে শিশুর অকাল মৃত্যু বন্ধ করা যায়।

হাম

শিশুর জন্মের প্রথম ছয়মাস মায়ের বুকের দুধ রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এরপর অনেক শিশুর হাম হয়। হাম হলে প্রচণ্ড জ্বর হয়, সঙ্গে সর্দি, কাশি, চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ থাকে। চার পাঁচদিন পর শরীরে গুটি দেখা দেয়। সময়মত চিকিৎসা না করলে আমাশয় এবং নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। নয় মাস বয়সে একবারই হামের ইনজেকশন নেওয়া দরকার। পোলিওর মত বারবার নিতে হয় না। হাম ভাইরাসজনিত রোগ। অপুষ্টির কারণে হামের সঙ্গে নানা জটিলতা দেখা দেয়। বাড়ীতে একটি শিশুর হাম হলে অন্য শিশুদেরও হাম হবার সম্ভাবনা থাকে। হাম একবার হলে পরে আর হবার আশঙ্কা থাকে না।

হাম দেখা দিলে শিশুর বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অন্য শিশুদের দূরে রাখতে হয়। সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য ও সরবত খাওয়াতে হয়। ঝাড়ফুঁক বা মেথির জলে হাম সারে না। এসব কুসংস্কার বাদ দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হবে।

পোলিও টিকা

খাদ্য বা জলের সঙ্গে পোলিও জীবাণু শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্যনালী থেকে স্নায়ুতন্ত্রে আক্রমণ করে। পোলিও আক্রান্ত হলে শিশুর শরীরের কোন কোন অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়। সাধারণ জ্বর, মাথাব্যথা, পেট ব্যথা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ থাকে। বেশী হলে ঘাড় ও পিঠ শক্ত হয়ে যেতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

তাই পোলিও টিকা নেওয়া খুব জরুরী। মুখে খাওয়ানোর টিকা আছে। আবার ইনজেকশনও আছে। দেড়মাস বয়স হলে এক বা দেড়মাস পরপর তিনবার

এবং এক বছর পর শেষ ডোজ খাওয়াতে হবে। জ্বর বা পেট খারাপ অবস্থায় টিকা নেওয়া উচিত নয়।

টাইফয়েড টিকা

যেকোন বয়সে টাইফয়েড হতে পারে। অবিরাম জ্বর, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, পেট খারাপ ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ। সময়মত চিকিৎসা না করলে বিপদ হতে পারে। এজন্য টাইফয়েড টিকা বা ইনজেকশন নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ডাক্তারের পরামর্শ মত খাওয়ার ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন দিতে হবে।

বি সি জি টিকা

যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে বি সি জি টিকা দেওয়া হয়। শরীরের যেকোন অঙ্গে যক্ষ্মার আক্রমণ হতে পারে। তাই শিশুকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যথাসময়ে বি সি জি টিকা দিতে হবে।

ডি পি টি ইনজেকশন

শিশুরে জন্মের পর নাভি কাটার দোষে ধনুষ্টংকার রোগের আক্রমণ হতে পারে। এতে শিশুর জীবন সংশয় হয়। ধনুষ্টংকার, ডিপথরিয়া এবং হুপিংকপ তিনটি কঠিন রোগের আক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করে ডি পি টি ইনজেকশন। এটা চিকিৎসা জগতের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

শিশুর জন্মের দেড়মাস পর থেকেই এক থেকে দেড় মাসের ব্যবধানে পরপর তিনটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। এক বছর পর শেষ ডোজ দেওয়া হয়। পরে আবার পাঁচ বছর বয়সে হুপিংকপের ঔষধটি বাদ দিয়ে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই ইনজেকশন দেওয়া প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন। অসুস্থ শিশুর ক্ষেত্রে সময়ের এদিক ওদিক করা যেতে পারে। শিশুকে সুস্থ করেই ইনজেকশন দিতে হবে। পোলিও এবং ডি পি টি একসঙ্গেই নেওয়া যেতে পারে।

হেপাটাইটিস বি ইনজেকশন

যেকোন বয়সেই জণ্ডিস হতে পারে। এই রোগের ভাল চিকিৎসাও নেই। হেপাটাইটিস বি ইনজেকশন শিশুর জন্মের দুই তিন দিন পর থেকেই শুরু করা যায়। প্রতিষেধক নেওয়া থাকলে বিপদের আশঙ্কা কমে যায়। আরো নানা ধরনের

জণ্ডিস আছে। সবগুলোর প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। খাদ্য ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকলে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। অপুষ্টি এবং অপরিচ্ছন্নতা নানা রোগের প্রধান কারণ। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা বেশী ভোগে জ্বরে। নানা কারণে জ্বর হতে পারে। সর্দি, কাশি, পেট খারাপ, আমাশয়, টনসিল ইত্যাদি সমস্যা থেকে জ্বর হতে পারে। জ্বর কোন রোগ নয়। কোন একটি রোগের প্রকাশ মাত্র। ডাক্তারের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নেওয়াই উচিত।

সর্দি, কাশির টিকা নেই

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি শিশুই কোন না কোন সময়ে সর্দি কাশিতে কষ্ট পায়। শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় সর্দি, কাশি থেকে নানা জটিলতাও সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের আক্রমণে সর্দি, কাশি হয়। একই ভাইরাসের দ্বারা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সর্দি থেকে কানের সমস্যা দেখা দেয়। কানে কম শোনার ঘটনাও দেখা দেয়। ঘনঘন সর্দি ও কাশি হলে শিশুর শরীর খারাপ হয়। ক্ষিধে কমে যায়। ওজন কমে যায়, দুর্বলতা বেড়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। সর্দি, কাশির কোন প্রতিষেধক বা টিকা নেই। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শিশুর যত্ন এবং চিকিৎসা করতে হবে।

হুপিংকফ ও কাশি

অত্যন্ত ছোট শিশুরও হুপিং কাশি হতে পারে। এই কাশি খুবই কষ্টকর। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ক্লান্ত হয়ে শ্বাস নেবার সময় গলা দিয়ে হুপ হুপ শব্দ হয়। এজন্যই এই কাশির নাম হুপিং কাশি। প্রথমে সর্দি, কাশি হয়। ক্রমে ক্রমে হুপিং কাশিতে পরিণত হয়। কাশি সারতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। খুব ছোট শিশুর এই কাশি হলে বাঁচানো কঠিন হয়। শিশু কাশতে কাশতে বমি করে, দেড় মাস বয়স হলেই শিশুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে হবে। তাহলে হুপিং কাশি হলেও বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।

মাম্পস-এর টিকা

মায়ের দুধ খাওয়ার সময় এই রোগ সাধারণতঃ হয় না। পাঁচ বছর বয়সের পর এই রোগ হয়। বড়দেরও হতে পারে। ভাইরাসের আক্রমণে এই রোগ হয়।

মাম্পস রোগের লক্ষণ হল লালাগ্রন্থি ফোলে যায়, কানের নীচের গ্রন্থিও ফোলে। প্রচণ্ড ব্যথা হয়। জ্বর বাড়তে থাকে। অন্যান্য অংশেও আক্রমণ হতে পারে। এটা ছোঁয়াচে রোগ। তাই সতর্ক থাকতে হয়। সহজপাচ্য খাবার দিতে হয়। মাম্পস-এর প্রতিষেধক ইনজেকশন সময় মত দেওয়া উচিত। হাম এর সঙ্গে মাম্পস এর ইনজেকশন দেওয়া যায়।

শিশুর হাঁপানি

শিশুদেরও হাঁপানি হয়। বংশগত হলে সহজে ভাল হয় না। বংশগত না হলে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। সাবধানে থাকলে কষ্ট কম হয়। ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে হবে। নতুবা বড় হলে রোগ আবার ফিরে আসবে। তখন চিকিৎসা কঠিন হবে।

কৃমির সমস্যা

যেকোন বয়সেই কৃমির আক্রমণ হতে পারে। তবে শিশুরাই বেশী আক্রান্ত হয়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, অপরিষ্কার জল এবং নানা ধরনের খাদ্যের মাধ্যমে কৃমি শরীরে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অন্ত্রে বসবাসকারী স্ত্রী কৃমিরা একসঙ্গে অসংখ্য ডিম পাড়ে। মাঠেঘাটে পায়খানার সঙ্গে ডিমগুলো প্রচুর সংখ্যায় বেরিয়ে আসে। জলে ও শাকসব্জিতে ডিম মিশে গিয়ে আবার মুখ দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। ডিম ফুটে বাচ্চা কৃমি ফুসফুসে ঢুকে যায়। শ্বাসনালীর মাধ্যমে খাদ্যনালীতে ঢুকে যায়।

কৃমি হলে শিশুর ক্ষিদে কমে যায়, বমির ভাব হয়, পেটে ব্যথা হয়, পেট ফোলে উঠে, বদহজম হয়, পেট খারাপ হয়। পেটের কৃমিগুলো শিশুর পুষ্টিকর খাবার খেয়ে ফেলে। তাই শিশু দুর্বল হয়, শরীর শুকিয়ে যায়। বারবার কাশি হয়, অ্যালার্জি দেখা দেয়, খাদ্যনালী বন্ধ হয়ে বিপদ সৃষ্টি করে। ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে জটিলতা বেড়েই যাবে।

আমাদের দেশে তিন রকমের কৃমি দেখা যায়। (১) গোলকৃমি, (২) হুকওয়ার্ম (ক্ষুদ্র আকারের কৃমি) (৩) সূতো কৃমি (লম্বা আকৃতির কৃমি)।

কৃমির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ডাক্তার দেখাতে হবে, ঔষধ খেতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং খাদ্য সম্পর্কে

সতর্ক থাকতে হবে। শুধুমাত্র পানীয় জল বিশুদ্ধ হলেই চলবে না, স্নান করা, বাসন ধোয়া, রান্নায় বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ডায়রিয়া

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডাইরিয়া শিশুদের জীবনে নিত্য সঙ্গী বলা যায়। প্রতিদিন তিনবারের বেশী পাতলা পায়খানা হলেই তা ডায়রিয়া বলে গণ্য হয়। যদি পায়খানার সঙ্গে শ্লেষ্মা এবং রক্ত থাকে তবে আমাশয় বা রক্ত আমাশয় বলে গণ্য হয়।

পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীরের জল এবং লবণ বেরিয়ে যায়। শরীরের রক্ত মাংস জল ও লবণের অভাবে শুকিয়ে যায়- এই অবস্থাকে বলে ডিহাইড্রেশন। এরকম অবস্থায় দ্রুত চিনি-লবণ-জল ও একটু লেবুর রস দিয়ে সরবত তৈরী করে বারে বারে খাওয়াতে হবে। ডাবের জলও খাওয়ানো যেতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের ফর্মূলায় তৈরী ইলেকট্রল প্যাকেট কিনে নির্দেশ মত জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। জটিলতা দেখা দিলে দেরী না করে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

ডায়রিয়ার প্রধান লক্ষণগুলো হল- (১) ঘনঘন তেষ্টা পাওয়া (২) নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া (৩) প্রস্রাব কমে যাওয়া, (৪) জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, (৫) শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া, (৬) চোখ বসে যাওয়া (৭) অস্থিরতা।

ডায়রিয়া রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ শরীরে জল ও লবণের অভাব। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকলে বিপদ এড়ানো যায়। ওঝা বা জলপড়া নয় ডাক্তারই হল এই রোগের একমাত্র বন্ধু।

ডায়রিয়ার বিপদের লক্ষণ

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে বিপদের লক্ষণগুলো মনে রাখতে হবে। (১) পেট ফাঁপা, (২) খিঁচুনি হওয়া (৩) বারবার বমি করা, (৪) হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া (৫) প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধের জন্য সতর্কতার বিষয়গুলো হল- (১) জল ফুটিয়ে খাওয়া (২) খাওয়ার আগে হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে নেওয়া (৩) বাসনপত্র

পরিষ্কার জলে ধোওয়া, (৪) বাসি খাবার, বাজারের খোলা খাবার, কাটা ফল না খাওয়া, (৫) রোগীর পায়খানা, বমি গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়া ইত্যাদি।

আমাশয়

পাতলা পায়খানার সঙ্গে শ্লেষ্মা থাকলে আমাশয় এবং সঙ্গে রক্ত থাকলে রক্ত আমাশয় বলে। এই রোগও শিশুদের বেশী হয় যদিও সব বয়সেই এ রোগ হতে পারে। এই রোগ দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাবেন। এই রোগে আক্রান্ত হলে ঔষধ খাওয়াতেই হবে।

দুর্ঘটনা

শিশুরা বড় হতে হতে চঞ্চল হয়ে উঠে। অবুঝ শিশুদের ভাল মন্দ বিচার বোধ থাকে না। তাই বিভিন্ন রকম আঘাত বা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। এ বিষয়ে শিশুর মা এবং পরিবারের সকলকেই সতর্ক থাকতে হয়। আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া, খাট থেকে পড়ে যাওয়া, মাথায় আঘাত লাগা, শরীরের কোথাও কেটে যাওয়া, গরম জল, গরম দুধ থেকে বিপদে পড়া, জলে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নানারকম দুর্ঘটনায় অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ডাক্তার দেখাতে হবে।

শিশুর নাগালের মধ্যে যাতে কোন ঔষধ, কীটনাশক বা কেরোসিন পেট্রোলের মত বিষাক্ত জিনিস না থাকে সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। হাঁটতে শিখলে শিশুর গতিবিধির উপর বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। পুকুরে বা নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা অনেক ঘটে। আগুনে পুড়ে যাবার ঘটনাও ঘটে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তার হল প্রকৃত বন্ধু।





শিশুর বিভিন্ন সমস্যা

ছয় মাস বয়সে শিশু হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। এই সময় খাট থেকে পড়ে যাবার ভয় থাকে। প্রথম হাঁটার সময় বা খেলাধূলা করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেতে পারে। মাথায় আঘাত পাবার পর যদি হাসি খুশী থাকে এবং বমি না করে তবে ভয় থাকে না। কিন্তু শিশু যদি আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং খিঁচুনি দেখা দেয় তবে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে।

কোন কোন শিশুর নাক দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। শিশু নখ দিয়ে নাক চুলকানোর ফলেও এমনটা হতে পারে। অন্য কোন কারণেও হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা হল শিশুকে বসিয়ে রেখে মাথা নিচু করে রাখতে হবে যাতে নাকের রক্ত ভেতরে চলে না যায়। অথবা কাত করে শুইয়ে রেখে নাকে মুখে বরফ গলা ঠাণ্ডা জল তুলো ভিজিয়ে দিতে হবে। এতেও রক্ত বন্ধ না হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

শিশুকে কুকুর, বিড়াল, বানর বা শেয়ালে কামড়ালে ডাক্তার দেখিয়ে অবশ্যই ইনজেকশন দিতে হবে। এসব পশুর কামড় থেকে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশী। ইনজেকশন দেওয়া হলে ভয় থাকে না।

শিশুর শরীরের হাত, পা বা অন্য কোন অংশ কেটে গিয়ে রক্তপাত শুরু হলে প্রথমেই রক্তপাত বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুকে শুইয়ে দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে উঁচুতে তুলে বরফ গলা জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটিকে চেপে ধরলেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বেশী কাটা গেলে সেলাই করতে হবে। সেলাই কষ্ট হলেও ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

শিশুরা ক্ষিদে পেলেই কান্নাকাটি করে। পেট পুড়ে খাবার পেলে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। কিন্তু পেট ব্যথার কারণে কান্নাকাটি হলে তা সহজে থামতে চায় না। তিন মাস বয়স পর্যন্ত মাঝে মাঝে শিশুর পেট ব্যথা হয়। পায়খানা হলে ব্যথা কমে যায়। অন্য কারণেও শিশুরা কান্নাকাটি করে, যেমন- বিছানায় প্রস্রাব বা পায়খানা করা, কানে ব্যথা বা কোলে নেবার জন্যও শিশুরা কান্নাকাটি করে। পরিবারের অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তির কান্নার কারণ বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারেন। ক্ষিদে পেলে আঙ্গুল চুষে শিশু ক্ষিদের কথা বুঝিয়ে দেয়।

বড়দের নানা রোগ

ইনফ্লুয়েঞ্জা

এই রোগের লক্ষণ সাধারণ সর্দি কাশির মতই। কিন্তু অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। শুষ্ক কাশি, পিঠে ব্যথা, জ্বর, মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণা, টনসিল ব্যথা ইত্যাদি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ।

সাধারণ সর্দি কাশি ঠাণ্ডা বা গরম আবহাওয়ার জন্য দেখা দেয়। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুঘটিত রোগ। বাতাসে মিশে থাকা জীবাণু দেহে প্রবেশ করে এই রোগ সৃষ্টি করে। আমাদের পরিবেশে বায়ুতে অসংখ্য রোগের জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে আক্রমণ করে। যাদের শরীরে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা শক্তিশালী তারা সহজে কাবু হয় না। যাদের প্রতিরোধ শক্তি কম তারাই সহজে আক্রান্ত হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু নানা ধরনের আছে। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের সাহায্যে। কোন কোন ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মক ধরনের হয়। জীবন নাশেরও কারণ হয়। অনেক সময় মহামারি রূপে দেখা দেয়।

সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে সহজপাচ্য খাবার ও হাল্কা পথ্য খেয়ে সামলে নেওয়া যায়। তিন চারদিন জ্বরে ভোগার পর বিশ্রাম এবং পথ্য দ্বারা ভাল না হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। নতুবা নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। ব্রংকাইটিস, প্লুরিসি, নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে বিপদের কারণ ঘটাতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে মারাত্মক প্রাণঘাতি মেনিনজাইটিস রোগের সৃষ্টি হতে পারে। সময়মত ডাক্তার দেখালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

ম্যালেরিয়া

ক্ষুদ্র মশার আক্রমণে ম্যালেরিয়া, গুণগুনিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের উৎপাত শুরু হয়। বহুকাল যাবৎ রোগের কারণ জানা না থাকায় প্রয়োজনীয় ঔষধ আবিষ্কার করা যায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যটি প্রাচীন কাল থেকেই ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। কয়েকজন রাজাও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ভারতভুক্তির পর স্বাস্থ্য বিভাগ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ম্যালেরিয়া

প্রায় নির্মূল করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঝে মাঝে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। পুরানো ঔষধে কাজ হচ্ছে না। নতুন নতুন ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কারের ফলে প্রতিরোধের নানা পদ্ধতিও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। মশার কামড় থেকে মুক্ত থাকার জন্য রাতে মশারি খাটিয়ে ঘুমানো, মশা যাতে আশেপাশে জন্মাতে না পারে তার ব্যবস্থা করা, নোংরা জলে এবং বদ্ধ জলাশয়ে মশা ব্যাপকভাবে জন্মায়। ঔষধ ছিটিয়ে মশা ধ্বংসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবার ফলে ম্যালেরিয়া অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ম্যালেরিয়া ছোঁয়াচে রোগ নয়। মশা আক্রান্ত রোগীর রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে বেড়ায়। এই মশা যাকে কামড়াবে তার শরীরেই রক্তের মধ্যে মিশে যাবে ম্যালেরিয়া জীবাণু। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী থাকলে রোগের প্রকোপ বেশী হয় না।

অজকাল ঔষধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া আরো কঠিন রূপ নিয়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এটা খুবই মারাত্মক। ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় যেকোন ধরনের জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ ধরা পড়লেই কুইনাইন খাওয়া শুরু করা যায়। অবশ্য সুযোগ থাকলে ডাক্তারেব পরামর্শ নেওয়া একান্তই কর্তব্য।

অনেক সময় রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে না। পরপর তিন দিন রক্ত পরীক্ষা করে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। ডাক্তারের পরামর্শ মত সঠিক মাত্রায় সঠিক ঔষধ না খেলে বা বেশীদিন খেলে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি হার্ট এবং কিডনীর ক্ষতি হয়ে যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাথমিক উপসর্গ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা এবং ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া। এ নিয়ম অনেকের ক্ষেত্রে মিলে না। জ্বর আছে কাঁপুনি নেই। হয় বেশী জ্বর নয়তো ফুসফুসে জ্বর। জ্বর প্রতিদিন দুই তিনবার বাড়ে কমে। বমি বমি ভাব থাকে। মাথাব্যথা থাকে। আবার দুদিন পরপর জ্বর আসে।

খুব বেশী জ্বর যখন দেখা দেয় তখন বুঝতে হবে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়া, রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া এগুলো হল বিপদের লক্ষণ।

কালাজ্বর

দুইশ বছর আগে গারো পাহাড়ে ম্যালেরিয়ার মতই একপ্রকার জ্বরের প্রকোপ ব্যাপকহারে দেখা দেয়। এই রোগে শরীরের বর্ণ কালো হয়ে যায় বলে এর নাম হয়েছে কালা জ্বর।

মশার চেয়ে ক্ষুদ্র একপ্রকার পোকার আক্রমণে কালাজ্বর হয়। যেখানে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী সেখানেই কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাবও বেশী দেখা যায়। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা দুর্বল হয়ে পড়ে তারা সহজেই কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়। কুইনাইন খেয়ে কালাজ্বর কমে না। দীর্ঘকাল এই রোগের ঔষধ ছিল না। তাই কালাজ্বরে প্রচুর লোক মারা যেত। এর জন্যই এই রোগকে বলা হতো কাল রোগ অর্থাৎ মৃত্যু রোগ। বর্তমানে এই রোগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্য এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা-বিহার-ওড়িশায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। এই রোগে শরীর রক্তহীন হয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়। গায়ের রং ও জিহ্বার রং কালো হয়ে যায়। পেটের নানা অসুখ এবং আমাশয় লেগেই থাকে। জ্বর সহজে কমে না। রক্ত বমিও হতে পারে। সময়মত ডাক্তার দেখালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

কালাপানি জ্বর

কালাজ্বরের চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি রোগ হল কালাপানি জ্বর। একাদিক্রমে কয়েকদিন জ্বর থাকে। তারপর জ্বর কমে বাড়ে এবং কালো বা বেগুনী রঙের প্রস্রাব হয়। এজন্যই রোগটির নাম হয়েছে কালাপানি জ্বর।

অনেকে বলেন, কুইনাইন বেশী খাওয়ার ফলে এই রোগটি হয়। কুইনাইন আবিষ্কারের আগে এরূপ রোগের কথা শোনা যায়নি। এই রোগ প্রবল হলে হার্ট ফেল করে রোগী মারা যায়। এই রোগে কুইনাইন খেয়ে লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হয়। লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেই প্রস্রাবের রং কালো হয়। কালমেঘ খেয়ে কিছু উপকার পাওয়া যায়। স্যালাইন দিয়ে রোগীর দেহ থেকে বিষাক্ত রস নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আধুনিক নানা ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সঠিকভাবে হলে এসব রোগের আক্রমণ কমই হয়।

চিকন গুনিয়া ও ডেঙ্গু জ্বর

এক জাতীয় মশার কামড়ে চিকন গুনিয়া নামের একটি রোগ সৃষ্টি হয়। এডিস ইজিপটাই নামের এক জাতীয় মশা এই রোগ সৃষ্টি করে এবং ছড়ায়। ত্রিপুরায় এই জাতের মশা বিরল। বাংলা-বিহার-ওড়িশায় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়। ১৯৫৫ সালে আফ্রিকায় প্রথম এই রোগের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রে এই রোগ ধরা পড়েছে। ১৯৭১ সালে জানা যায় যে, এই মশার উপদ্রব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের পরিবেশে এই রোগের মশা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আয়ুর্বেদ ডাক্তাররা এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কালমেঘ, চিরতার জল, নিমপাতার রস, তুলসী পাতার রস, হলুদ, অশ্বগন্ধা এগুলো ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। আয়ুর্বেদ মতে এগুলো পিত্তজনিত রোগ। সাতদিন জ্বর থাকে। সময়মত সাবধান হলে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে না। এই রোগের লক্ষণ হল

১) হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হওয়া।

২) সন্ধিস্থলে ও মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হওয়া।

৩) খাওয়ার অরুচি, (৪) চোখ লাল হওয়া।

৫) অত্যধিক ক্লান্তি, (৬) ত্বকের উপর চাকা চাকা দাগ।

এই রোগের ভাল ঔষধ এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এখনো তা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরেই রয়েছে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী উপসর্গ ভিত্তিক ঔষধ খেতে হবে। মশার জন্ম ও বৃদ্ধি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। মশারি খাটিয়ে ঘুমাতে হবে।

আরেক জাতীয় মশার আক্রমণে ডেঙ্গু জ্বর হয়। লক্ষণ গুনগুণিয়া জ্বরের মতই। চিকিৎসাও একই রকম। দেশের বড় বড় শহরের বস্তি এলাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নোংরা জলে এসব মশার জন্ম ও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ গরমের দেশেই এসব মশার জন্ম ও বৃদ্ধি দ্রুত হয়। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা জাতের মশার কামড় থেকে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেসব দেশের পরিবেশ বংশ বৃদ্ধির উপযুক্ত সেসব দেশেই মশারা আশ্রয় নিচ্ছে। অন্যান্য আরো নানা ধরনের কীটপতঙ্গের কামড়েও নানা রোগের সৃষ্টি হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

টাইফয়েড

দূষিত জল এবং খাবারের মাধ্যমে টাইফয়েড রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। জীবাণু বহনকারী মলমূত্রের মাধ্যমে দূষিত জল টাইফয়েড রোগ ছড়ায়। নানাভাবে এই দূষণ ঘটে। বন্যার সময় চতুর্দিকে জলে দূষিত মলমূত্র মিশে যায়। নদী, পুকুর, জলাশয়ের এই দূষিত জল যারা ব্যবহার করেন, তারা সহজেই টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। দূষিত জলে বাসনপত্র ধোয়া, হাতমুখ ধোয়া, রান্না করা ইত্যাদি কাজ চলতে থাকলে জীবাণু সরাসরি শরীরে ঢুকে যায়।

শহরে পাইপ লাইনে ফুটো থাকলে দূষিত জল পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারে জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। শহরের রাস্তার পাশে হোটেল, রেষ্টুরেন্টে দূষিত জল ব্যবহার করা হলে জীবাণু সরাসরি অনেকের শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। বহুতল বাড়ীর উপরে ও নীচে জলের ট্যাংক দীর্ঘকাল পরিষ্কার না করা হলে টাইফয়েড জীবাণুর আবাসস্থল হয়ে যায়।

এই জন্যই জল পরিশোধন ব্যবস্থার দিকে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া নিরাপদ। বাসনপত্র ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলে সবচেয়ে ভাল। রান্না করা খাবার গরম গরম খেতে হবে। রাস্তার কোন খাবারই নিরাপদ নয়।

গ্রামে পুকুর বা কূয়ার জল কোন পাত্রে রেখে ফিটকিরি দিয়ে সারা রাত রেখে দিতে হবে। অল্পমাত্রায় ব্লিচিং পাউডার অথবা সম্ভব হলে জল শোধনের হ্যালোজিন টেবলেট মিশিয়ে নেওয়া উচিত। ফিল্টার ব্যবহার করলে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

টাইফয়েড রোগের উপসর্গ শুরু হয় জ্বর এবং কপালে ব্যথা দিয়ে। এক সপ্তাহ পর জ্বরের মাত্রা বাড়তে থাকে। ক্ষুধা কমে যায়, কুষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, বমি বমি ভাব হয়। পেটে, মুখে, শরীরে র‍্যাশ দেখা দেয়। লিভার এবং পিলে বড় হতে থাকে, জিহ্বার একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় ডায়রিয়া, দেখা দেয় ডিহাইড্রেশন, রক্তচাপ কমে যায় রোগী ভুল বকতে শুরু করে অবস্থা খুব খারাপের দিকে চলে যায়। পেটে ঘা হয়ে রক্তপাতও হতে পারে, রক্ত বমিও হয়।

প্রথম সপ্তাহে ব্লাড কালচার করে রোগ ধরা পড়লে সময় মত ঔষধও ভিটামিন খাওয়ানো হলে রোগ বাড়তে পারে না। প্রয়োজনে পায়খানা পরীক্ষা করা হয় এবং ইউরিন কালচার করা হয়। একসময় টাইফয়েড রোগেরও ঔষধ

ছিল না। রোগ জীবাণু সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। তখন এই রোগে আক্রান্তদের বেশীর ভাগই মারা যেত। বর্তমানে অনেকরকম ভাল ঔষধ পাওয়া যায়। সময়মত ডাক্তার দেখালে ভয় থাকে না।

প্যারাটাইফয়েড

আরেক ধরনের জলবাহিত জীবাণুর আক্রমণে প্যারা টাইফয়েড রোগ হয়। উপসর্গ টাইফয়েডের মতই। চিকিৎসাও প্রায় একইরকম। এই রোগে জটিলতা কম হয়। রক্ত, পায়খানা, প্রস্রাব পরীক্ষা করলেই রোগটা ধরা পড়ে। কি ধরনের এন্টিবায়োটিক ঔষধে কাজ হবে তা রক্ত ও প্রস্রাব কালচার করে সহজেই জানা যায়।

জ্বর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার দাবার ও পানীয় জলের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। বমি বন্ধ করার ঔষধ, ভিটামিন, ফুটানো জল, ফলের রস, স্যুপ, হরলিক্স, নরম ভাত, হাল্কা ঝোল, ঘোল ইত্যাদি দিতে হবে এবং ডাক্তার দেখাতে হবে।

পেটের অসুখ গ্যাস্ট্রিক

পেটে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। কিছু রোগ হয় যান্ত্রিক বিকৃতির জন্য। আবার অনেক রোগ হয় জীবাণু বা ভাইরাস থেকে। পেটের যেকোন রোগকে অনেকে গ্যাস্ট্রিক বলে চালিয়ে দেন। এতে চিকিৎসায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের কাছে শুধু বলা উচিত কি কি অসুবিধে বা কষ্ট হচ্ছে। বুকে জ্বালা, গলায় জ্বালা, পেটে ব্যথা, মাথা ধরা স্পষ্টভাবে যা কষ্ট হচ্ছে তাই ডাক্তারকে বলতে হবে। ডাক্তারই ঠিক করবেন কি কি পরীক্ষা করে আসল রোগটির সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্যাস্ট্রিক কোন রোগ নয়, একটা লক্ষণমাত্র। গ্যাস্ট্রিক আলসারকে একটা রোগ বলা যায়। পেটের ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। আলসার, ক্যান্সার, গলব্লাডারে বা প্যানক্রিয়াসে পাথর, লিভারে ক্ষত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে পেটে গ্যাস এবং ব্যথা হতে পারে। বুকের জ্বালা হার্টের কোন অসুখের জন্যও হতে পারে। কাজেই রোগী শুধু কষ্টের কথাই বলতে পারেন। ডাক্তারই উপসর্গ বুঝে সঠিক রোগটি চিহ্নিত করতে পারেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রত্যেক মানুষের পেটেই গ্যাস আছে। কিন্তু

গ্যাস থাকলেই গ্যাস্ট্রিক হয় না। পেটের সবরকম সমস্যাকে গ্যাস্ট্রিক বলে ভাবতে থাকলে সঠিক চিকিৎসা হবে না। মুখে টক, ঢেকুর ওঠা, কানে ব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ, বুকে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, ঘুম না হওয়া সব কিছুই গ্যাস্ট্রিক বলে ভাবাটা ভুল।

গ্রীক শব্দ গ্যাস্টারের অর্থ হল পেট। তাই পেটের যাবতীয় সমস্যাকে গ্যাস্ট্রিক বলে প্রচার করা হয় বা ভাবা হয়। গ্যাস্ট্রিকের জন্য অনেক রকম ঔষধ খোলাবাজারে বিক্রি হয়। কোন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই দোকানদার রোগীর চাহিদা মত বিভিন্ন রকমের টেবলেট, ক্যাপসুল বা শিশির ঔষধ বিক্রি করছে। অথচ কেউ কোন ফল পাচ্ছে না। কারণ আসল রোগ গ্যাস্ট্রিক নয়।

ইংরেজীতে ডিসপেপসিয়া নামে পেটের অসুখের একটা তালিকা আছে। তারই একটি গ্যাস্ট্রিক অর্থাৎ পেটের সমস্যা। বাংলায় বদহজম যাকে বলে তাই হল ডিসপেসসিয়া।

এই রোগের নানা উপসর্গ আছে যেগুলো অন্য অনেক রোগের উপসর্গের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন- বুক ব্যথা, এটা হার্টের ব্যথাও হতে পারে। হার্টের ব্যথায় গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ খাওয়ালে বিপদ হতেই পারে। এরকমভাবে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, বমির ভাব, বুক জ্বালা করা, মুখ টক হওয়া, মুখে জল আসা, মাথা ধরা, কোমর ধরা, ক্ষুধা না থাকা, ঢেকুর ওঠা, অ্যাসিড হওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ বিভিন্ন রোগেই থাকতে পারে।

তাই সঠিক রোগটি জানার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই হয়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগ নির্ণয়ের অনেক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে যা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। রক্তের জিন পর্যন্ত এখন যাচাই ও বিশ্লেষণ করা যায়। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আধুনিক যুগের ডাক্তারদের পরিচয় হয়। প্রতিটি অঙ্গের কার্যকলাপের ধারা এবং বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে পারে।

পেটের অনেক রোগ আছে যা সারা জীবন বহন করতে হয়। খাদ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সতর্কতা অবলম্বন করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হলে উপসর্গ অনুযায়ী ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ খেতে হবে।

পেটে আমাশা হলে বা খাদ্যনালীর সমস্যা হলে পেটে মোচর দিয়ে ব্যথা হতে পারে। তাছাড়া পিত্তনালীতে, বা কিডনীতে অথবা মূত্রাশয়ে পাথর হলেও

পেটে ব্যথা হতে পারে। এপেণ্ডিসাইটিস হলেও পেটে ব্যথা হতে পারে। একই ঔষধে সব ব্যথার চিকিৎসা হতে পারে না। কাজেই সব ব্যথাকে গ্যাস্ট্রিক ভাবলে সঠিক চিকিৎসা হয় না।

মুখে জল আসা, মুখ টক হওয়া, এগুলো আপনা থেকেই সেরে যায়। পেটে বাতাস ঢুকতে এবং বেরুতে ঢেকুর ওঠা। এটা কোন রোগ নয়। **পেটে পাঁচ ধরনের গ্যাস থাকে।** বাতাস থেকে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস পেটে ঢুকে। মিথেন, হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নামে তিনটি গ্যাস তৈরী হয় খাদ্য হজম হবার মাধ্যমে।

যেকোন খাবার খাওয়ার সময় মুখ দিয়ে প্রচুর বাতাস পেটে প্রবেশ করে। খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালী এই উভয় পথে বাতাস শরীরে যাতায়াত করে।

যে পাঁচটি গ্যাসের কথা বলা হল এদের কোন গন্ধ নেই। অথচ পেটের অভ্যন্তরে যে গ্যাস থাকে তার ৯৯ শতাংশ হল এই পাঁচটি গ্যাস। বাকি ১ এক শতাংশ গ্যাস বদহজম থেকে তৈরী হয়, তাতে গন্ধ থাকে।

পেটে বেশী বাতাস থাকলে পেট ভার ভার বোধ থাকতে পারে, পেট ফোলা ফোলা মনে হবে। ঢেকুর ওঠে বাতাস বেরিয়ে গেলে শান্তি নতুবা বাতাস অন্ত্রের ভেতর দিয়ে নীচের দিকে চলে যাবে। গ্যাস পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা কখনো বুকে বা মাথায় ওঠে না। মলদ্বার হল বাতাস বেরিয়ে যাবার স্বাভাবিক পথ।

পেপটিক আলসার/গ্যাস্ট্রিক আলসার

পাকস্থলীর প্রধান কাজ হল খাদ্য হজম করার জন্য অ্যাসিড তৈরী করা। অ্যাসিড যাতে পাকস্থলীর কোন ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য দেয়ালে একটা প্রলেপ থাকে। কিন্তু খাদ্য গ্রহণের দোষে অ্যাসিড বেশী জমে গেলে দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি করে। এটাকেই বলা হয় **পেপটিক আলসার।**

পাকস্থলীর অ্যাসিড যদি খাদ্যনালীতে ঢুকে পড়ে তবে খাদ্যনালীতেও ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এটাকে বলে **গ্যাস্ট্রিক আলসার।**

এই রোগের প্রধান উপসর্গ বুক জ্বালা করা। কারো কারো মুখ তেতো বা টক হয়। এন্টাসিড বা শুধু জল খেলেই এই উপসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খাওয়ার এক ঘন্টা পর বুক জ্বালা শুরু হয়। অনেক সময় এই রোগে দীর্ঘমেয়াদী কাশি বা এজমা সৃষ্টি হয়। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

খাদ্যনালীর ঘা শুকিয়ে নালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি খাদ্যনালীতে ক্যান্সারও সৃষ্টি হতে পারে।

এণ্ডোস্কোপি এবং এক্স-রে করে পেটের সঠিক অবস্থা বুঝে নিতে পারলে ঔষধেই রোগ সারতে পারে। তবে খাওয়া দাওয়া ও জীবনযাত্রায় সতর্ক হতে হবে। মনে রাখতে হবে এই রোগ প্রায় সারা জীবনের সঙ্গী।

পেপটিক আলচারের আরেকটি ধরণ হল - ডিওডেনাম আলসার। পাকস্থলীতে হলে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক আলসার আর ডিওডেনাম হলে বলা হয় ডিওডেনাম আলসার।

ডিওডেনাম আলসার

পাকস্থলীর পরের অংশটি ডিওডেনাম। হার্নিয়া হলে পাকস্থলীর উপরের বন্ধ মুখটি ঢিলে হয়ে যায়। ফলে পাকস্থলীর অ্যাসিড বেরিয়ে এসে ডিওডেনামে ক্ষত সৃষ্টি করে। অনেক সময় হার্নিয়া বড় হলে পাকস্থলী উপরের দিকে উঠে আসে। তখন উপর পেটে অ্যাসিডের জ্বালা হয়। ক্ষত শুকিয়ে খাদ্যনালী শুকিয়ে গেলে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। আগে এই অবস্থায় অপারেশন করা হতো। এখন ভাল ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। এণ্ডোস্কোপি করে রোগ ধরা পড়লে ঔষধেই চিকিৎসা হয়।

আলসারের চিকিৎসা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ঔষধ বন্ধ করলে আবার আলসারের যন্ত্রণা শুরু হয়। এই অবস্থার কারণ গবেষণা করে জানা গেছে পেপটিক আলসারে এক ধরনের জীবাণুর আক্রমণ হয়। ফলে বারবার ক্ষত সৃষ্টি হয়। এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। তাই সমস্যা হলেই সময়মত ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। সময়মত চিকিৎসা শুরু করলে ক্যান্সার ঠেকানো যায়।

গ্যাস্ট্রিক আলসার বা ডিওডেনাম আলসারের চিকিৎসা শুধু ব্যথা কমানো নয়। পুরোপুরি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আলসারের সঠিক অবস্থা বুঝে নেওয়া এবং বারবার যাতে আলসার দেখা না দেয় সেরকম ব্যবস্থা করা।

অনেক ঔষধের কারণে আলসার বেড়ে যায়। সেদিকেও ডাক্তারকে নজর দিতে হয়। যারা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই বাজার থেকে কিনে নিয়ে ব্যথার ঔষধ খান তাদের খাদ্যনালীতে ফুটো হয়ে যেতে পারে, রক্তপাত হতে পারে আলসার বেড়ে গিয়ে বিপদ হতে পারে।

আধুনিক পরীক্ষায় জানা গেছে, শতকরা ৯৫ শতাংশ আলসারের রোগীর পেটে জীবাণুর আক্রমণ হয়। পেটের অ্যাসিড আগুনের মতই শক্তিশালী। খাদ্যবস্তু হজমের জন্য তৈরী হয় অ্যাসিড। এমন শক্তিশালী অ্যাসিড খেয়ে হজম করতে পারে তেমন শক্তিশালী জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার হবার পর এই আলসারকে কোন ডাক্তার হাল্কাভাবে নিতে পারেন না। এন্টাসিড বা ব্যথার ঔষধে এই রোগের চিকিৎসা হয় না।

প্রথমেই এক্স-রে এবং পরে এণ্ডোস্কোপি করে রোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এণ্ডোস্কোপিতে পেটের ভিতরের ছবি পরিষ্কার দেখা যায়। এখন উন্নত ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কাজেই বিপদের কোন ভয় থাকে না। এই পরীক্ষায় সহজেই রোগ ধরা পড়ে যায়। এণ্ডোস্কোপিতে কিছু পাওয়া না গেলে অন্য কোন রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আনুমানিক চিকিৎসা করা ঠিক হবে না।

পেপটিক আলসারে পথ্য ও চিকিৎসা

পেপটিক আলসার দুই ধরনের হয়। গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাম। উভয় ক্ষেত্রেই উপসর্গ এক, পথ্যও এক। চিকিৎসাও প্রায় এক ধরনের হয়।

পথ্য হবে হাল্কা ঝাল মশলাহীন। অবশ্য জিরে, ধনে, আদা ব্যবহার করাই উচিত। রোগীর খাদ্য স্বাদহীন হলে খাওয়া যাবে না। দুধ বেশী নয়। কারণ দুধে অ্যাসিড কমে না বরং বাড়তে সাহায্য করে। টাটকা শাকসব্জি, ফল খেতে হবে।

চা-কফি, বিড়ি সিগারেট একদম বন্ধ করতে হবে। আসল কথা এমন খাবার দিতে হবে যাতে পেটে জ্বালা হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়।

পেপটিক আলসারের জীবাণুর কথা যতদিন জানা ছিল না ততদিন অ্যাসিড কমানোর চিকিৎসাই করা হতো। বর্তমানে জীবাণু ধ্বংস করার চিকিৎসাই বেশী গুরুত্ব পায়। তাই এখন এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড কমানোর ঔষধও দিতে হয়। কড়া অ্যাসিডের মধ্যেও যে জীবাণু টিকে থেকে আক্রমণ চালায় তাকে ধ্বংস করা খুব কঠিন। এখন দুটো ঔষধই সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করে আলসার ভাল করা যায়।

নিয়মিত ঔষধ পথ্য খেয়েও যদি আলসার না সারে তবে ক্যান্সার আছে কিনা তা গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। বর্তমানে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ক্যান্সারও ভাল হয়।

আগে পেপটিক আলসার সারানো যেত না। এন্টাসিড খেয়ে খেয়ে যতটা পারা যায় সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হতো। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা হতো। তাছাড়া বিভিন্ন উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো। অনেকে অপারেশন করে শেষ চেষ্টা করতেন। কিন্তু আলসারের জীবাণু সম্পর্কে কিছুই জানা না থাকায় সুফল পাওয়া যেত না। তাছাড়া উন্নত চিকিৎসার উপযোগী এন্টিবায়োটিক ঔষধও তখন পাওয়া যেত না।

পাকস্থলীতে রক্তপাত হলে কালো পায়খানা হয়। এমন অবস্থাকে বলা হয় ম্যালিনা। কালো পায়খানা এবং বমির সঙ্গে রক্ত দেখা গেলে দেরী না করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

আমাশা বা অ্যামিবিয়াসিস

আমাশা জলবাহিত রোগ। দূষিত জলের মাধ্যমে, খাদ্যের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। মাছি এই রোগ ছড়াতে বিশেষভাবে দায়ী।

দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষেরা নোংরা জল ব্যবহার করে। খাবার সময় হাত মুখ ধোয় না। খাদ্যে মাছি বসলে তাড়াবার প্রয়োজনবোধ করে না। এসব লোকেরাই আমাশা রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। জিয়ারডিয়া আক্রমণও একই পথ ধরে চলে।

অ্যামিবিয়াসিস রোগটি হয় এক ধরনের এক কোষী প্রাণী বা জীবাণু অ্যামিবা থেকে। খালি চোখে দেখা যায় না। বৃহদন্ত্রের দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি করে। পেট ভার হয়, আমযুক্ত পায়খানা হয়, পেটে মোচর দিয়ে ব্যথা হয়, পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। ক্রমে ক্রমে রোগটি ক্রণিক আকার ধারণ করে। কখনো আমাশা, কখনো কুষ্ঠকাঠিন্য, কখনো বদহজম, কখনো পেট ব্যথা, ক্ষিদে কমে যাওয়া, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা বাড়তে থাকা এসব উপসর্গ দেখা দেয়। এই অবস্থাকেও অনেকে ভুল করে গ্যাস্ট্রিক ভাবেন। এন্টাসিড খেযে সমস্যা বাড়িয়ে তুলেন।

পেটের অ্যামিবার দুটো চেহারা। যখন শরীরে আক্রমণ চালায় তখন জেলির মত থাকে। যখন বংশ বৃদ্ধি করে তখন ক্ষুদ্র আকারের সর্ষের মত হয়। মলের সঙ্গে দুটোই বের হয়। প্রথম চেহারার জেলি শরীরের বাইরে এসে অচল হয়ে যায়। দ্বিতীয় চেহারার বীজটি জল বা খাদ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে যেকোন শরীরে প্রবেশ করে বাসা বাঁধতে পারে এবং রোগ সৃষ্টি করতে পারে। খোলা পায়খানা নোংরা জল, নোংরা খাবার এই রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ।

অনেকদিন যাবৎ আমাশায় ভোগলে অন্ত্র শক্ত হয়ে যায়, রোগ সারানো কঠিন হয়। অনেক সময় পেটে টিউমারের মত হয়, লিভারে পুঁজ হয়। পেটে ফুটো হয়।

এতদিন ধারণা ছিল আমাশার কোন স্থায়ী চিকিৎসা নেই। কিন্তু বর্তমানে এমন ভাল ঔষধ আছে যা সঠিক মাত্রায় পেটে গেলে রোগ সারবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেকেই পুরো মাত্রায় ঔষধ খান না। একটু ভাল হলেই ঔষধ বন্ধ করে দেন। ফলে কিছুদিন পরই আবার আক্রান্ত হন। তাছাড়া রোগ সেরে গেলেও রোগের যে মূল কারণ নোংরা জল, নোংরা খাবার, মাছি, হাত না ধুয়ে খাবার অভ্যেস ইত্যাদির যদি পরিবর্তন না হয় তবে এ রোগ কোন দিনই সারবে না। যেকোন বয়সে এই রোগের আক্রমণ হতে পারে।

জিয়ারডিয়া

জিয়ারডিয়া, আমাশার মতই আরেকটি আধুনিক পেটের রোগ। এই রোগের জীবাণু জেলির মত নয়। একটা লেজও আছে জীবাণুটির। এই রোগে শিশুরাই বেশী আক্রান্ত হয়। আমাশার মতই দারিদ্র্য-অজ্ঞতা এবং অপরিচ্ছন্নতা থেকেই এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়। মাছি নানাভাবে রোগটা ছড়ায়। অনেক সময় স্কুলের হোস্টেলে একসঙ্গে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

আমাশার মত জিয়ারডিয়া জীবাণুর দুটি অবস্থা। পেটের প্রথম অবস্থায় আক্রমণ ঘটায়, বীজানু অবস্থায় রোগ ছড়ায়।

এই রোগে আক্রমণ হলে হঠাৎ করে বেশী পরিমাণে পায়খানা শুরু হয়। অনেকদিন পেট খারাপ থাকে, বদহজম হয়, ঔষধ না খেলেও রোগ ধীরে ধীরে সেরে যায়। কিন্তু রোগের বীজ শরীরে থেকে যায়। বীজ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত বারবার আক্রমণ হয়। মলে খুব দুর্গন্ধ থাকে এবং মল তৈলাক্ত হয়। অনেক সময় কয়েকদিন কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিয়ে আমাশা দেখা দেয়। এভাবেই ঘুরে ফিরে রোগ চলতে থাকে।

জিয়ারডিয়া চিকিৎসা খুব সহজ। অনেক ভাল ভাল ঔষধ পাওয়া যায়। দামও বেশী নয়। পায়খানা পরীক্ষা করলেই রোগ ধরা যায়। তবুও রোগের আক্রমণ কমে না। কারণ রোগের কারণগুলো থেকে যায়। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও জীবনযাত্রা এ রোগ সারতে দেয় না।

ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ কোটি দরিদ্র মানুষ আমাশা ও জিয়ারডিয়ায় আক্রান্ত। রোগ সেরেও সারে না। কারণ রোগ সৃষ্টির পরিবেশের কোন উন্নতি হয় না।

অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশ এবং দরিদ্র জীবনযাত্রার কারণে আরেক স্থায়ী রোগ দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে বারে বারে আক্রমণ করছে সেটা হল কৃমি। নানা রকমের কৃমি আছে। ভাল ভাল ঔষধও আছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে চিকিৎসার সুযোগ নেই। আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাই শুধু এসব রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

গলস্টোন বা পিত্তপাথরী

মানুষের লিভারে তৈরী হয় পিত্ত। হলদে, কমলা ও সবুজ রং মেশানো তেতো পিত্ত। এই পিত্ত যে থলিতে জমা হয় তাকে বলে পিত্তথলি বা গলব্লাডার। এই গলব্লাডারে জমা পিত্ত প্রয়োজন মত ক্ষুদ্রান্ত্রে চলে যায় তৈলাক্ত খাদ্যবস্তু হজমে সাহায্য করার জন্য

পিত্তথলিতে কোন কারণে কোন জীবাণুর সংক্রমণ হলে বা পিত্তে মিশে থাকা কোলেস্টেরল আলাদা হয়ে গেলে পিত্তথলিতে পাথর সৃষ্টি হয়। ছোট বালুকণা থেকে বিভিন্ন সাইজের মার্বেলের আকারে পাথর জমতে থাকে। শরীরের ওজন বেশী হলে পাথর হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

পিত্তপাথরীর প্রধান উপসর্গ হল ব্যথা। বুকের ঠিক নীচে হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। ব্যথাটা কিছুতেই কমে না। ক্রমশঃ পিঠের দিকে ব্যথাটা ছড়িয়ে যায়। শক্তিশালী ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিলে কয়েক ঘন্টা পর ব্যথা কমে যায়। যদি ব্যথা না কমে তবে দেখতে হবে পিত্তপাথর কোথাও আটকে গেছে কিনা। পিত্তথলিতে কোন জীবাণু সংক্রমণ হলে জ্বর, ব্যথা, বমি হতে পারে। উপরের পেটে হাত দিলেই ব্যথা বাড়বে।

পিত্তথলিতে পাথর হলেই অপারেশন করা জরুরী কিনা তা ঠিক করবেন অভিজ্ঞ ডাক্তার। আধুনিক চিকিৎসায় আলট্রাসনোগ্রাপি পরীক্ষায় পেটের ভিতরের পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। পিত্তথলির পাথর মুখে এসে আটকে গেলে বা আশেপাশে ক্যান্সারের কোন সম্ভাবনা দেখা গেলে অপারেশন করে পিত্তথলি বা গলব্লাডার বাদ দেওয়া উচিত।

আজকাল গলব্লাডার অপারেশন খুব সহজ এবং অনেক বেশী নিরাপদ

হয়েছে। পেটে দু-তিনটি ফুটো করে এণ্ডোস্কোপির সাহায্যে টিভি ক্যামেরা দেখে দেখে নিরাপদে অপারেশন করা হয়।

ছোট আকারে পেট কেটেও অপারেশন করা হয়। তাছাড়া ঔষধ দিয়ে পাথর গলিয়ে বের করার ব্যবস্থাও আছে। গলব্লাডার সক্রিয় থাকলে এবং পাথর ছোট আকারের হলে ঔষধ দিয়ে গলিয়ে বের করার চেষ্টা করা হয়। দুই বছর ঔষধ খেতে হয়। ঔষধের দামও বেশী। শব্দ দিয়ে পাথর গুঁড়ো করার একটা পদ্ধতিও আছে। সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হল অপারেশন করা। অনেক সময় পিত্তথলিতে পুঁজ হয়ে লিভারে ছড়িয়ে যায় ডায়াবেটিস থাকলে পিত্তথলি পচে গিয়ে বিপদ ঘটাতে পারে।

কোলাইটিস

বৃহদন্ত্রের ইংরেজী নাম কোলন। এই কোলনের স্ফীতি এবং প্রদাহকে বলে কোলাইটিস। পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ হবার পর মল আকারে যে আবর্জনা তৈরী হয় তা বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেওয়াই কোলনের প্রধান কাজ। কোলন যখন সঠিকভাবে এই কাজ করতে পারে না তখনই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা চলতে থাকলে কোলনের মল বিষাক্ত হয়ে যায়। এই বিষাক্ত মলের প্রভাবে কোলন ফোলে উঠে এবং প্রদাহ বা জ্বালা শুরু হয়। কোমরে এবং পিঠে যন্ত্রণা হয়।

কোলাইটিস তিন ধরনের হয়- (১) মিউকাস কোলাইটিস (২) ক্যাটেরাল কোলাইটিস (৩) আলসারেটিভ কোলাইটিস

(১) মিউকাস কোলাইটিস- বৃহদন্ত্র বা কোলন শরীর থেকে মল বের করে দেবার জন্য মিউকাস সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত মল জমে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অপরিমিত খাবার এই সমস্যার জন্য দায়ী। মল শরীর থেকে বের হয়ে গেলে রোগী ব্যথা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

(২) ক্যাটারাল কোলাইটিস - কোলনে জমা মল দ্বারা কোলনের ঝিল্লী বিষাক্ত হয়ে গেলে রোগী জ্বরে আক্রান্ত হয়। তলপেটে শূল বেদনা শুরু হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় রোগী হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। এই অবস্থাকে বলে ক্যাটারাল কোলাইটিস।

(৩) আলসারেটিভ কোলাইটিস - কোলনে জমা বিষাক্ত মল, বিষাক্ত মিউকাস এবং বিষাক্ত অ্যাসিডের প্রভাবে কোলনে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ফলে মলের

সঙ্গে রক্ত, পুঁজ এবং মিউকাস বের হয়। এই বিষাক্ত মলে এক ধরনের জীবাণু সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলে আলসারেটিভ কোলাইটিস। এই রোগ ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি নামেও পরিচিত। এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে এবং যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা না হলে ক্যান্সারে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এরকম রোগ হলে চা-কফি-বিড়ি-সিগারেট, নস্য, মদ ইত্যাদি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। তীব্র ক্ষুধা দেখা দিলেই হাল্কা সহজ পাচ্য খাবার খেতে হবে। মাঝে মাঝে উপবাসে থাকা ভাল। ক্যান্সারের সম্ভাবনা দেখা দিলে কোলনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়। এই রোগ দেখা দিলে সতর্ক হওয়া দরকার।

কিডনী স্টোন

মেরুদণ্ডের উভয় পাশে লিভার এবং প্লীহা থাকে। একটু নীচে দুই পাশে দুটি কিডনী থাকে। লিভারকে নানাভাবে সাহায্য করে দুটি কিডনী। রক্তে মিশ্রিত দূষিত পদার্থ বের করার জন্য ছাকনির কাজ করে দুটি কিডনী।

রক্তবাহী প্রধান ধমনী থেকে রক্ত প্রবাহ সোজাসুজি কিডনীতে প্রবেশ করে। কিডনী কোষগুলোতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম তন্তুগুচ্ছ ছাকনির কাজ করে। দূষিত পদার্থ মিশ্রিত রক্তের জলীয়ভাগ এবং বিষাক্ত পদার্থ একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে মূত্রাশয়ের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করে। হার্টের কাজ ঠিকভাবে চললেই কিডনীর কাজও সুষ্ঠুভাবে চলে। হার্ট দুর্বল হলে কিডনীর কর্মক্ষমতাও দুর্বল হয়। শরীরে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে।

অতিরিক্ত আমিষভোজীরা কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অম্বল রোগে আক্রান্ত হয়। এরকম অবস্থায় কিডনী সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। দূষিত পদার্থ জমে পাথরে পরিণত হয়। গলস্টোনের মতোই কিডনীর স্টোন বিভিন্ন আকারের হয়।

গলস্টোনের মতই কিডনী স্টোনেও যন্ত্রণা হয়। অপারেশন করে স্টোন বের করতে হয়। আজকাল অনেক উন্নত ধরনের ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে। ঔষধে কাজ না হলে অপারেশন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কিডনীতে নানা কারণে পাথর হতে পারে যেমন-

(১) খাদ্যাভ্যাসের ত্রুটির জন্য, (২) জল কম খাওয়ার জন্য,

(৩) ঔষধের প্রতিক্রিয়ার জন্য, (৪) কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগত কারণে। বেশী পরিমাণে মাংস বা দুধ খেলেও কিডনীতে পাথর হতে পারে।

কিডনীতে পাথর হলে বিভিন্ন জনের উপসর্গ বিভিন্ন রকম হতে পারে। কারো কারো কোমরের উপরের দিকটায় পিঠের কাছে খুব ব্যথা হয়। ব্যথা সামনে আসে এবং উপরে নীচে উঠানামা করে। কখনো কখনো প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হয়। পিঠের ব্যথা হলে অনেক সময় আর্থাইটিস মনে করে ব্যথা কমার ঔষধ খান। ফলে বিপদ বেড়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে জ্বর আর প্রস্রাবের সংক্রমণ থেকে রোগ ধরা পড়ে। যাদের কোন কষ্ট হয় না তাদের, রোগ ধরা পড়ে অনেক দেরীতে কোন একটি উপসর্গের পরীক্ষা করতে গিয়ে।

মাঝে মাঝে অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য বা হজমের গোলমাল হলে কিডনীতে পাথর হবার কথা চট করে মনে আসে না। হজমের গণ্ডগোল দেখে গলস্টোনের কথা ভেবে অলট্রাসনোগ্রাফি করে কিডনীর স্টোন ধরা পড়ে গেল এমনও হয়। যাদের শুরুতেই প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হয় তাদের কিডনী পাথর সহজেই ধরা পড়ে। ব্যথা বা জ্বরের জন্য যারা এন্টিবায়োটিক খেতে শুরু করেন তাদের সমস্যা বেশী হয়। প্রস্রাব পরীক্ষা এবং আলট্রাসনোগ্রাফি করলেই কিডনী পাথর প্রথমেই ধরা পড়ে যায়। সময়মত চিকিৎসাও শুরু করা যায়।

কিডনীতে ছোট ছোট পাথর হলে অপারেশনের দরকার হয় না। ঔষধেই সেরে যায়। প্রতিদিন চার লিটার জল খেতে হবে। ৬ মাসে একবার অলট্রাসনোগ্রাফি করে দেখতে হবে পাথরের অবস্থা কেমন আছে। কিডনীর কর্মক্ষমতাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বর্তমানে কিডনী পাথর বের করার তিনটি পদ্ধতি আছে।

(১) পেট কেটে পাথর বের করা।

(২) আলট্রাসাউণ্ডের সাহায্যে পাথর গুঁড়ো করে প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে আনা।

(৩) এণ্ডোস্কোপিক পদ্ধতিতে পিঠে একটা ছোট ছিদ্র করে যন্ত্র ঢুকিয়ে পাথর বের করে আনা।

প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ অপারেসন করে পাথর বের করার চেয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে পাথর বের করার কাজটা সহজ, রোগীরও কষ্ট কম হয়। খরচটা একটু বেশী হয়। পাথর একবার হলে বারবার পাথর হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পেট কেটে বারবার পাথর বের করা কষ্টকর। তবে কোন পদ্ধতিতে পাথর

বের করা হবে তা পাথরের ধরন এবং কিডনীর কর্মক্ষমতার উপরও অনেকটা নির্ভর করে। পাথর বড় হলে তৃতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করাই উচিত। এই পদ্ধতিকে বলে পি সি এন এল এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম হল লিথোট্রিপসি। পাথর বড় হলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একবারে সব পাথর গুঁড়িয়ে বের করে আনা যায় না। কাজেই একাধিক সিটিং দরকার হয়। তাতে খরচ বেশী পড়ে।

যাদের দুটো কিডনীতেই পাথর হয় তাদের ক্ষেত্রে বারবার পাথর হবার প্রবণতা বেশী দেখা যায়। সেজন্য কিডনীর সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। রক্তে ক্যালসিয়াম বেশী থাকলে বা প্যারাথাইরয়েড থাকলে এরকম সমস্যা দেখা দেয়। ঐ সমস্যার চিকিৎসা হলে পাথর হবার প্রবণতা কমে যায়।

কি কি কারণে পাথর হয়েছে তা পরীক্ষা করে রোগীর খাবার তালিকা ঠিক করা হয়। প্রতি বছর একবার রক্ত ও প্রস্রাব অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।

পেট কেটে অপারেশন করলে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রায় দশদিন থাকতে হয়। তারপর বাড়ী গিয়ে একমাস বিশ্রাম নিতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পাথর গুঁড়িয়ে প্রস্রাবের মুখ দিয়ে নল ঢুকিয়ে পাথর বের করলে সেদিনই বাড়ী ফেরা যাবে। কিন্তু পাথর বড় হলে ১২দিন পরপর একেকটা সিটিং দিয়ে পাথর বের করতে হবে। তৃতীয় পদ্ধতিতে পাথর বের করলে হাসপাতালে তিনদিন এবং বাড়ীতে ৪-৫ দিন বিশ্রাম নিলেই চলবে।

কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট

কিডনীকে বলা হয় শরীরের ছাকনি। কিন্তু কিডনী ছাকনি ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। শরীরের দূষিত পদার্থ রক্ত থেকে ছেঁকে নিয়ে মূত্রনালীর মাধ্যমে বাইরে পাঠায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত লিভারে পাঠায় কিডনী। শুধু এটুকু কাজ হলে তা ডায়ালিসিস পদ্ধতিতে চালিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু কিডনীর কাজ এখানে শেষ হয় না। নতুন রক্ত তৈরীতে সাহায্য করা, রক্তচাপ ঠিক রাখা, হাড় গঠনে সাহায্য করা, শরীরে জল এবং লবণের মাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখা ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কিডনী।

তাই দু'টি কিডনী যখন খারাপ হয়ে যায় তখন কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা ছাড়া উপায় থাকে না। একটি কিডনী ভাল থাকলে শরীরের প্রয়োজনীয় কাজগুলো

সচল থাকে। যেকোন একজন সুস্থ ব্যক্তির একটি কিডনী পেলেই কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে অসুস্থ কিডনী রোগীকে বাঁচানো যায়।

সুস্থ ব্যক্তির একটি কিডনী অপারেশন করে কেটে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে পেট কেটে বসিয়ে দিতে হয়। যেকোন ব্যক্তির কিডনী হলেই চলবে না। রক্তের গ্রুপ এবং টিস্যু ম্যাচিংয়ের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সুস্থ ব্যক্তি একটা সুস্থ কিডনী নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন কিন্তু সেই একটি কিডনী যদি অসুস্থ হয়ে অকেজো হয়ে যায় তখন কি হবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে অনেকেই কিডনী দান করতে রাজী হন না। অতি দরিদ্র মানুষেরা পেটের দায়ে কিডনী বিক্রি করে থাকে।

কিডনী রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দরিদ্র মানুষেরা নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই কিডনী বিক্রি করে পরবর্তী সময়ে বিপদে পড়ছে। দক্ষিণ ভারতে এমন গ্রামও পাওয়া গেছে যেখানে প্রতিটি মানুষ একটি করে কিডনী বিক্রি করে আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করেছে বা ঋণ শোধ করেছে। আবার দালালেরাই কিডনী বিক্রির শতকরা সত্তর শতাংশ টাকা পকেটস্থ করেছে। সমীক্ষায় ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ পাওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট কিডনী বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। ফলে এখন একমাত্র নিকট আত্মীয়ের দান ছাড়া কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্ভব হচ্ছে না। বহু কিডনী রোগী জেনেশুনে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

তাছাড়া সুস্থ ডোনার পেলেও এই চিকিৎসার বিরাট খরচ বহন করা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য হয়ে পড়ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে মানুষের শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোর জন্য কৃত্রিম যন্ত্র তৈরীর গবেষণা চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে। হার্ট, লিভার ও কিডনী রোগের সমস্যা বাড়ছে এবং ক্রমাগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। লিভার প্রতিস্থাপন এখন সম্ভব হচ্ছে। দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের কিডনী, লিভার, হার্ট, চোখ ব্যবহার করে চিকিৎসা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেই কিডনী রোগীরা কৃত্রিম কিডনীর সাহায্যে নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন আশা করা যায়।

কিডনী রোগীর উপসর্গগুলো হল - ক্লান্তি, অবসাদ, প্রস্রাব কমে যাওয়া, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, ক্ষিদে কমে যাওয়া, খাওয়ার পর বমি হওয়া, পা ফুলে

যাওয়া, মানসিক উৎকণ্ঠা বেড়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া ইত্যাদি। এ রোগের চিকিৎসার জন্য যেতে হবে একজন অভিজ্ঞ নেফ্রোলজিস্টের কাছে।

অকেজো কিডনী পাল্টানোর জন্য যদি সুস্থ ডোনার পাওয়া যায় তবেই চিকিৎসার পথ মসৃণ হতে পারে।

প্রস্তুতিপর্বে কয়েকজন ডোনারকে পরীক্ষা করে রক্ত ও টিস্যুর ম্যাচিং যার সঙ্গে মিলবে তাকেই ডোনার হিসেবে বেছে নিতে হবে। এসব পরীক্ষাতেও ভাল টাকা খরচ হবে।

কিডনী দাতার বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শারীরিকভাবে খুব সুস্থ হতে হবে। বিশেষ করে কিডনী সংক্রান্ত কোন গোলযোগ যাতে না থাকে। ডায়াবেটিস বা ব্লাডপ্রেসার বা হার্টের কোন সমস্যা যাতে না থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এরপর রক্তের গ্রুপ এবং টিস্যু ম্যাচিং-এর পরীক্ষা করাতে হবে।

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে নিতে হবে। অপারেশনের পর তিনটি বিষয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে প্রথম এক বছর।

(১) রোগ সংক্রমণ (ইনজেকশন) সম্পর্কে সতর্কতা।

(২) নতুন কিডনী শরীর সহ্য করতে পারছে কিনা দেখা।

(৩) ঔষধপত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা।

প্রথম তিনমাস সপ্তাহে একবার ডাক্তার দেখাতে হবে। পরের তিনমাস দুই সপ্তাহে একবার এবং পরের এক বছর মাসে একবার ডাক্তার দেখাতে হবে। শরীরে কোনরকম সংক্রমণ হচ্ছে কিনা। নতুন কিডনী শরীরে মানিয়ে চলতে পারছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে ঔষধের মাত্রা কম বেশী করতে হবে। এজন্যই ডাক্তারের কাছে ঘনঘন যেতে হবে।

অপারেশনের পর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রোগীর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। বাড়ীতে কারো জ্বর, সর্দি, কাশি, হাঁচি, পেট খারাপ ইত্যাদি হলে কিডনী রোগীকে দূরে রাখতে হবে। খাবার জল, বাসনপত্র জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে, রান্নাঘর, বিছানাপত্র ও বাথরুম সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বাজারের কোন তৈরী খাবার খাওয়া চলবে না। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন

ঔষধ খাওয়ানো যাবে না। এসব স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে না চললে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কিডনী রোগী খুব সহজেই নিউমোনিয়া, মেনেনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রস্রাবের ইনফেকশানও হতে পারে। এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এপেণ্ডিসাইটিস

মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রে (স্মল ও লার্জ ইনটেস্টাইন) মাঝখানে থাকে এপেণ্ডিক্স। তলপেটের ডানদিকে কোণায় এর অবস্থান। পাশে থাকে সিকাম, কোলন এবং মহিলাদের ওভারি, টিউব। এগুলোর প্রত্যেকটির উপসর্গ প্রায় একরকম। সামান্য প্রদাহ হলেই পেটে ব্যথা হয়। এই ব্যথা কিসের থেকে হচ্ছে তা বোঝা কষ্টকর হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা ব্যথার ধরন দেখেই বুঝতে পারেন। কিসের ব্যথা হচ্ছে।

এপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা শুরু হয় পেটের মাঝখানে নাভির কাছ থেকে। ডানদিকের তলপেটে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। অল্প জ্বর হয়, বমির ভাব থাকে বা বমি হতেও পারে। ডানদিকের তলপেটে চাপ দিলে রোগী তীব্র ব্যথাবোধ করে। বাঁদিকে চাপ দিলেও ডানদিকে ব্যথা তীব্র হয়। এই ব্যথার ধরন দেখে এপেণ্ডিসাইটিসের রোগ ধরা পড়ে। ঔষধ খেয়ে কমে গেলেও ঘুরে ঘুরে ব্যথা আসতে পারে। ক্রজিক হয়ে গেলে ব্যথার তীব্রতা থাকে না। ব্যথা ছড়িয়ে থাকে ডানদিকের কোমর পর্যন্ত। ক্ষুদ্রান্ত থেকে বৃহদন্ত্রে জীর্ণ খাদ্য নামার পথে জীবাণু সংক্রমণের কারণে এই রোগ হয়।

এপেণ্ডিক্স কেটে বাদ দিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। তাই অপারেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এপেণ্ডিক্স সুস্থ অবস্থায় টনসিলের মত রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে। কিন্তু অচল অবস্থায় উল্টো কাজ করে। তখন এপেণ্ডিক্স রোগ ছড়িয়ে দেবার কাজটি করে। তাই কেটে বাদ দেওয়াই শরীরের পক্ষে ভাল। অনেক সময় এপেণ্ডিক্সে পুঁজ হয়ে বিষাক্ত হয়। পেটের মধ্যে এই বিষাক্ত পুঁজ প্রবেশ করে মৃত্যু ঘটাতে পারে। পেট কেটে অপারেশন করলে ভেতরে কোন জটিলতা থাকলে তা ঠিক করে দেওয়া যায়। লেপারোস্কোপিক অপারেশন করলে পেটে তিনটি ফুঁটো করে অপারেশন করা হয়। রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। খরচ একটু বেশী হয়।

লিভার/জণ্ডিস

লিভার খারাপ হলেই জণ্ডিস হয় এমন একটা ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আসল ব্যাপারটা না জেনে অনেকে হতাশায় ভোগেন। লিভার খারাপ হলে বদহজম হয়, ক্ষিদে নষ্ট হয়, শরীরে শ্বেতী হয়, চর্ম রোগ হয়, মুখে ঘা হয়, পেট ফুলে যায় এমন সব অহেতুক ধারণা থাকায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

লিভার হল শরীরের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর একটি। আমরা যা কিছু খাই সবই লিভারের মাধ্যমে রক্তে যায়, তৈলাক্ত জিনিস ছাড়া। তেল হজম করার জন্য পিত্তরসের প্রয়োজন হয়। লিভার পেটের ডানদিকে বুকের মধ্যচ্ছদার নীচে থাকে। ওজন প্রায় দেড় কেজি, লিভার শরীরের একমাত্র অঙ্গ যার অঙ্গচ্ছেদ হলে নতুন করে গজাতে পারে। এক টুকরো লিভার কেটে বাদ দিলে তা আবার নতুন করে গজাবে। লিভার অনেক কিছু সহ্য করতে পারে।

লিভারে তৈরী হয় বিলিরুবিন। তার থেকে তৈরী হয় পিত্ত। এই পিত্ত জমা হয় পিত্তনালীতে তারপর পিত্তনালী দিয়ে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। এখানেই স্নেহ পদার্থ হজমের ব্যবস্থা হয়।

রক্তে যদি বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী হয়ে যায় তাহলেই জণ্ডিস হয়। রক্তের কোন রোগে বা ম্যালেরিয়ায় বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী হয়ে যেতে পারে। লিভার তাড়াতাড়ি শোধন করে দিতে না পারলে এমনটা হয়। অবার লিভার নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেও বিলিরুবিন সঠিকভাবে শোধন হয় না। এরকম হতে পারে হেপাটাইটিস বা লিভার সিরোসিস হলে। অথবা যদি কোন কারণে পিত্তনালী বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও বিলিরুবিনের পথ আটকে যায়। এমনটা হতে পারে গলব্লাডার স্টোন বা ক্যান্সার হলে।

লিভার থেকে শুরু হয়ে পিত্তনালী শেষ হয়েছে ডিওডেনামে। মাঝখানে রয়েছে পিত্তথলি অর্থাৎ গলব্লাডার। পিত্তথলিতে জমা পিত্তকে গাঢ় করে চর্বি জাতীয় খাদ্যকে হজম করার উপযুক্ত করে ডিওডেনামে পাঠায়। পিত্তনালী এবং পিত্তথলি উভয় জায়গাতেই যদি পাথর জমে তাহলে গলব্লাডার অপারেশনের সময় পিত্তনালীর পাথরও বের করে আনতে হয়। এখানে ভুল হলে অপারেশনের পরও জণ্ডিস হতে পারে। পিত্তথলির সঙ্গে পিত্তনালীর অনেকটা যদি কেটে ফেলা হয় তবে মারাত্মক জণ্ডিস হয়।

পেটে ক্যান্সার হলেও জণ্ডিস হয়। লিভার থেকে শুরু করে পিত্তনালী, পিত্তথলি, প্যানক্রিয়াস, পাকস্থলী, কোলন ও জরায়ু ইত্যাদির যেকোন জায়গায় ক্যান্সার হলে জণ্ডিস হয়। এসব ক্ষেত্রে ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গ হল জণ্ডিস।

অবস্ট্রাকটিভ জণ্ডিস থাকলে তিনটি উপসর্গ থাকবে। (১) প্রস্রাব হলুদ হবে (২) প্রচুর পায়খানা হবে। কাদাকাদা, ফেনা ফেনা পায়খানা হবে (৩) গায়ে চুলকানি থাকবে। সাধারণ জণ্ডিসে চুলকানি থাকে না। চোখ হলুদ, বমি বমি ভাব, খাওয়াতে অরুচি থাকবে। জণ্ডিস বেড়ে গেলে রক্ত বমি, রক্ত পায়খানা শুরু হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে আলট্রাসনোগ্রাফি করে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে। কোথাও পাথর থাকলে অপারেশন করে বের করতে হবে। জণ্ডিসের কারণ বুঝতে না পারলে সিটি স্ক্যান করা জরুরী। টিউমার বা ক্যান্সার প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়লে সুচিকিৎসা হতে পারে। জণ্ডিস খুব বেশী হয়ে গেলে অপারেশন করা বিপজ্জনক হয়। কারণ জণ্ডিস বেশী দিন চলতে থাকলে শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি দেখা দেয়। অপারেশনে প্রচুর রক্তপাত হয় রোগী সেটা সহ্য করতে পারে না। বিলিরুবিন কিডনীর খুব ক্ষতি করে। তাতে শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। লিভার এবং কিডনী দুটিই অসুস্থ হয়ে পড়লে রোগী কোমা পর্যায়ে চলে যায়।

অপারেশনের আগে জণ্ডিস কমাবার ঔষধ দিয়ে এবং সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে রোগীকে অপারেশনের উপযুক্ত করে নিতে হয়। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

হেপাটাইটিস

লিভারে এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে যে জণ্ডিস হয় তাকে বলা হয় ভাইরাস হেপাটাইটিস। এই রোগ অনেক রকমের হয়। হেপাটাইটিস-এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি নামে এসব রোগ পরিচিত। সবচেয়ে বেশী হয় হেপাটাইটিস এ এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল হেপাটাইটিস বি। বর্তমানে এর প্রতিষেধক ইনজেকশন পাওয়া যাচ্ছে।

যেকোন বয়সে এসব রোগের আক্রমণ হতে পারে। তাই প্রতিষেধক ইনজেকশন নেওয়াই উচিত। এগুলো সবই লিভারের রোগ।

জণ্ডিসের ভাইরাস ছড়ায় জলের মাধ্যমে এবং খাদ্যের মাধ্যমে মাছির সাহয্যে। আর হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ছড়ায় রক্তের মাধ্যমে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

শরীর ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। জ্বর, শীত শীত ভাব, পাতলা পায়খানা, বমি ভাব, খাওয়া দাওয়ায় অরুচি, হলুদ প্রস্রাব, চোখের সাদা অংশ হলুদ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। লিভার একটু বড় হয়। ডাক্তার হাত দিয়ে বুঝতে পারেন। বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ে লিভার কতটা খারাপ হয়েছে। রোগীর প্রধান কষ্ট খেতে না পারা। যা যায় তাই বমি হয়ে যায়। রোগী দুর্বল হয়ে যায়।

ভাইরাস কোন ঔষধে কাবু হয় না। তবু উপসর্গ অনুযায়ী ঔষধ দিতেই হয়। বিশ্রাম এবং উপযুক্ত পথ্য প্রয়োজন।

অনেক সময় বিভ্রান্ত শিক্ষিত মানুষও গ্রাম্য ওঝার খপ্পড়ে পড়েন। জলপড়া, মন্ত্রপড়া, গাছের পাতা বা শিকরের রস খাওয়া ইত্যাদি ওঝার পরামর্শ মত ব্যবহার করে রোগীর বিপদ বাড়িয়ে দেন। সংস্কার, কুসংস্কার এখনো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে।

হলুদ খেলে জণ্ডিস বাড়ে এই ধারণাই ভুল। রোগীর পথ্যে হলুদ থাকবে, অল্প পরিমাণে মশল্লা থাকবে। তেল ঘি খুব কম খেতে হবে। কারণ তেলাক্ত জিনিস খেলে বমির ভাব বেড়ে যায় হজমের অসুবিধা হয়।

বেশীর ভাগ জণ্ডিস আপনা থেকেই ভাল হয়। বিশ্রাম, পথ্য এবং প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ নিয়মিত খেতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু জণ্ডিস আছে যা রক্ত নষ্ট করে দেয়। এরকম জণ্ডিসে ওঝার উপদেশ মত চিকিৎসা করলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

রোগ বেড়ে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। বাড়ীতে রেখে নানাজনের পরামর্শ মত চিকিৎসা করা বিপজ্জনক হতে পারে।

লিভারে জীবাণু আক্রমণে পুঁজ জমে গেলে জণ্ডিস হতে পারে। এই অবস্থাকে বলে লিভার অ্যাবসেস। অ্যামিবিয়াসিসের আক্রমণে অ্যাবসেস হতে পারে। এই অবস্থায় খুব জ্বর হয়। পেটের ডানদিকে ব্যথা হয়। খুব তাড়াতাড়ি আলট্রাসনোগ্রাফি করে রোগ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। অবহেলা করলে বিপদ অনিবার্য। **লিভার শুকিয়ে যাওয়াকে বলে লিভার সিরোসিস। বারবার বিষাক্ত জীবাণুর আক্রমণে লিভার শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। পেটে জল জমে পেট ফুলে যায়। জণ্ডিস দেখা দেয়। সময়মত চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু হয়।**

যক্ষ্মা রোগ বা টিবি রোগ

যক্ষ্মা রোগ বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এটা ক্ষয়রোগ নামেও পরিচিত। আধুনিককালে এটা টি বি রোগ হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

মানবদেহের ফুসফুসে যক্ষ্মা রোগ বাসা বাঁধে। শরীরের যেকোন অঙ্গেই যক্ষ্মা হতে পারে। বাতাসে, জলে এবং খাবারে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মার জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। যাদের শরীরে প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় তারাই যক্ষ্মা রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়।

ছোটবেলায় যাদের বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তারা সহজে এই রোগে আক্রান্ত হয় না। যদি কোন কারণে আক্রান্তও হয় তবে তাদের ক্ষেত্রে রোগ মারাত্মক হয় না। একসময় বলা হতো যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই। বিসিজি ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবার পর সেই ধারণা বদলে গেছে।

যক্ষ্মা দুই ধরনের হয় (১) প্রাইমারি (২) পোষ্ট প্রাইমারি। প্রথমে যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে প্রতিরোধ শক্তিকে পরাজিত করে যদি বাসা বাঁধে তবে তাকে বলা হয় প্রাইমারি যক্ষ্মা। ঔষধ ব্যবহার করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করলে প্রাইমারি রোগ সেরে যায়।

কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি যক্ষ্মা আক্রমণ করার সুযোগ পায় তখন মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তখন শুধু ফুসফুসে নয়, শরীরের যেকোন জায়গায় বাসা বেঁধে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়লে যক্ষ্মার জীবাণু তখন চুপচাপ থাকে। শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কম হলেই আবার আক্রমণ শুরু করে। মূল লক্ষ্য ফুসফুস ধ্বংস করা। যাদের বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে তাদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মার আক্রমণ ফুসফুসে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোন অঙ্গে প্রবেশ করে না। ফলে চিকিৎসা সহজ হয়।

সময়মত এবং সঠিক পরিমাণে ঔষধ না খেলে যক্ষ্মা রোগ মারাত্মক আকার নেয়। পরে কোনও ঔষধেই কাজ হয় না। এরূপ অবস্থাকে বলা হয় মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্ট টিবি। **রোগ না সারতেই ঔষধ বন্ধ করে দেবার ফলে এমন হয়।**

যক্ষ্মা রোগ মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। ফলে জীবাণু যেমন হবে আক্রমণও তেমনই হবে। নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হলেও অনেকের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় না। কফ কালচার করে জানা যায় এ ধরনের রোগীর জন্য কি ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

চার সপ্তাহ নিয়মিত ঔষধ খাওয়ার পর রোগীর শরীরে জীবাণু পাওয়া না গেলে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় একমাস আলাদা থাকা উচিত। পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে কিন্তু তা দামী না হলেও চলবে। টাটকা শাকসব্জি, মাছ, দুধেই যথেষ্ট পুষ্টি পাওয়া যায়। কম দামের ফল খেলেই চলে। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের জন্য পরপর তিনদিন কফ পরীক্ষা এবং বুকের একটা এক্স-রে করলেই রোগ ধরা পড়ে। কঠিন অবস্থায় কফ কালচারের প্রয়োজন হয়। আজকাল সব হাসপাতালেই এসব পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে।

প্লুরিসি

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্লুরিসি রোগের উল্লেখ নেই। কারণ প্লুরিসিকে যক্ষ্মা রোগের প্রাথমিক স্তর মনে করা হতো। যক্ষ্মার আক্রমণস্থল হল ফুসফুস। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ফুসফুসের ঝিল্লী অর্থাৎ পাতলা পর্দার নাম হল প্লুরা। যক্ষ্মার প্রাথমিক আক্রমণ হল প্লুরাতে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে প্লুরিসি।

প্রথম পর্যায়ে শুষ্ক কাশির সঙ্গে অল্প জ্বর থাকে প্লুরিসিতে। কাশির বেগে রোগীর বুকে ব্যথা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফুসফুসের মাঝখানে জল জমে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। ফুসফুসের ঝিল্লী বেশ পুরু হয়। এই ঝিল্লী থেকে এক ধরনের রস তৈরী হয়। যার ফলে ফুসফুসের সঙ্গে পাজরের সংঘর্ষ হয় না।

ফুসফুসের ঝিল্লীতে যক্ষ্মা জীবাণু বাসা বাঁধলে রস ক্ষরণ কমে যায়। ফলে বুকে ব্যথা হয়। শুষ্ক কাশি দেখা দেয়।

আমাদের দেহে ফুসফুস হল সবচেয়ে বড় অঙ্গ। ওজন প্রায় দুই কেজি হয়। তার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ হল লিভার ওজন হয় প্রায় দেড় কেজি। হার্টের নীচেই থাকে প্লীহা। লিভার এবং প্লীহা শরীরের রক্ত শোধন এবং রক্ত তৈরী করে। উভয়ে পরস্পর পরিপূরক। রোগ জীবাণু ধ্বংস করার মত প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতাই আছে লিভার এবং প্লীহার। লিভার এবং প্লীহা অসুস্থ হলে বা দুর্বল হলে ফুসফুসের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। তখনই যক্ষ্মা রোগের জীবাণু শক্তিশালী হয়ে উঠে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

প্লুরিসি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হলে খাদ্য এবং ঔষধ ঠিকভাবে ব্যবহার করলে মারাত্মক যক্ষ্মা হতে পারে না।

যক্ষ্মা রোগীর শরীরে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। এজন্যই পাহাড়ের

স্বাস্থ্যনিবাসে বা সমুদ্রতীরে কিছুকাল থেকে ডাক্তারের পরামর্শমত খাদ্য, পথ্য, ফল ও ঔষধ গ্রহণ করলে যক্ষ্মা রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। যাদের এরূপ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা বা সুযোগ থাকে না তাদের পক্ষে নিজের বাসস্থানে খোলামেলা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থেকে ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ, পথ্য ও খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

নিউমোনিয়া

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ফুসফুস প্রদাহ রোগটির আধুনিক নাম হয়েছে নিউমোনিয়া। এই রোগের বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, লোবর নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

আমাদের দুটি শ্বাসনালী ফুসফুস পর্যন্ত প্রসারিত। শ্বাসনালীর প্রদাহ ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ফুসফুসের একটিতে বা দুটিতেই প্রদাহ সৃষ্টি হলেই নিউমোনিয়া প্রকার ভেদ হয়।

হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর আসে, একদিকে আক্রমণ হলে ব্যথা একদিকে থাকে। দুদিকে আক্রান্ত হলে বুকের দুদিকেই ব্যথা থাকে। এরূপ অবস্থাকে বলে ডাবল **নিউমোনিয়া**। কাশির সঙ্গে ঘন আঠার মত কফ বের হয়। ঠোঁট ও মুখ কিছু নীলাভ রং ধারণ করে। ফুসফুসে পুঁজ হয়ে গেলে রোগীর অবস্থা মারাত্মক হয়।

টাইফয়েড বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু থেকেও নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুসফুস শরীরের দূষিত রক্ত শোধন করে। দূষিত রক্তের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে ফুসফুস সম্পূর্ণ রক্ত শোধন করতে পারে না। হার্টে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব দেখা দেয়। এই সুযোগে দুর্বল ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এই সময় প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু রোগীর পক্ষে জরুরী প্রয়োজন। তারপরই চিকিৎসা, পথ্য, খাদ্য, ঔষধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রংকাইটিস

শ্বাসনালীর প্রদাহকে ব্রংকাইটিস বলে। শ্বাসনালীর ইংরেজী নাম ব্রংকি। তার থেকে রোগটির নাম হয়েছে ব্রংকাইটিস। পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগের আক্রমণ হয়।

প্রথমে সর্দি, কাশি এবং অল্প জ্বর হয়। রোগী খাদ্য গ্রহণ করতে গলায় কষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাসেও কষ্ট শুরু হয়। বুকে অস্বাভাবিক চাপ চাপ ভাব হয়। এই

রোগ বৃদ্ধি পেয়ে টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া রোগে পরিণত হয়। শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয় এবং কষ্টও বেশী ভোগ করে। দুর্বল ফুসফুস এবং দুর্বল টনসিল থেকেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা বাতাস, ধুলা, বালি, ধূয়া, কুয়াশা ফুসফুসে ঢুকে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগীর জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এবং ক্ষুধা তীব্র না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য দেওয়া ঠিক নয়। ধীরে ধীরে জল মিশ্রিত পাতলা দুধ এব ফলের রস পথ্য দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

কলেরা, বসন্ত ও জলবসন্ত

কলেরা, বসন্ত ও জলবসন্ত এক সময় এ দেশের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ বলে গণ্য হতো। জল ও খাদ্যের মাধ্যমে রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে এই রোগ সৃষ্টি করে। রোগ জীবাণু সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার ফলে জল ও খাদ্য সম্পর্কে সতর্কতা ছিল না। ফলে পরিবারে একজনের এসব রোগ হলেই সবাই পরপর আক্রান্ত হতো। গ্রামের মানুষ একই পুকুর থেকে জল ব্যবহার করতো। রোগীর মল মূত্র বমি কাপড় চোপড় বিছানাপত্র পুকুরে অবাধে ধোয়া হতো ফলে সব পরিবারেই দ্রুত এসব রোগ ছড়িয়ে পড়তো দ্রুত বেগে। দেশে তখন কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না বলে আক্রান্ত রোগীরা একে একে মারা যেত। মহামারি সৃষ্টি হলে মৃতদেহ সৎকারের লোকও পাওয়া যেত না।

রোগ জীবাণু আবিষ্কার এবং নানা প্রকার ঔষধ আবিষ্কারের ফলে এসব রোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মানুষকে কলেরার ইনজেকশান এবং বসন্তের টিকা দিয়ে ব্যাপক মহামারি সৃষ্টির পথ বন্ধ করা হয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও অনেক সহজ হয়েছে।

তবু স্বাস্থ্য সচেতনতা না থাকলে অনেক সময় বিপদ ঘটে। কলেরা হলে চাউল ধোওয়া জলের মত পায়খানা হয়, বমি হয়, পায়খানা, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগী মারা যায়। ডিহাইড্রেশনই দ্রুত মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। বর্তমানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

বসন্ত রোগের টিকাও প্রতিটি মানুষকেই দেওয়ার ব্যবস্থা হতো। টিকা দেওয়ার ফলে সুস্থ মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতো। ফলে রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তো না। বর্তমানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ

ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং শিক্ষা প্রসারের ফলে রোগ জীবাণু সম্পর্কে সতর্কতার ফলে রোগের প্রকোপ যথেষ্ট কমেছে।

বসন্ত রোগের মৃদু আক্রমণকেই বলে জল বসন্ত বা চিকেন পক্স। বসন্ত রোগীর মাথায় পিঠে খুব যন্ত্রণা হয়, বমি, খিঁচুনি প্রলাপ বকাও দেখা দেয়। জ্বর খুব বেশী থাকে। কিন্তু চিকেন পক্স বা জল বসন্তের এসব থাকে না। জল বসন্তের গুটি বড় হয় কিন্তু সংখ্যায় খুব কম হয়। বসন্ত রোগের মত পুঁজ হয় না। জল জমে। কয়েকদিনের মধ্যেই গুটি শুকাতে থাকে। চিকিৎসা এবং নিয়মিত পথ্য নিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

খোস-পাঁচড়া-ফোঁড়া

শরীরের কোন জায়গায় চুলকানি হলে ফুস্কুড়ি দেখা দেয় এটাকে বলে খোস। এই খোসগুলো ছোট আকারের হয়। আঙ্গুলের ফাঁকে, হাতের কবজিতে, তলপেটে, পায়ে, এগুলো বড় হয়ে যখন পুঁজ উৎপন্ন করে তখন এই খোসগুলোকে বলা হয় পাঁচড়া।

গরমে ঘামাচি সাধারণত পিঠেই বেশী হয়। ঘামাচিগুলো, রোমকূপ জুড়ে বহু সংখ্যায় বের হয়। এগুলো সর্বদা চুলকায়। তাই খুব বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেশী চুলকালে ঘামাচি থেকে রক্তপাত হয়, জ্বালা করে।

রক্ত দূষিত হলে এবং শরীরে বেশী জল থাকলে খোস, পাঁচড়া, ঘামাচি ইত্যাদি হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলেও হতে পারে। পরিচ্ছন্নতা এবং শারীরিক যত্নের দ্বারাই এসবের উপশম হয়। বেশী হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

শরীরের চামড়ার উপরিভাগে পুঁজ জমে লাল হয়ে ফোলে উঠলে তাকে ফোঁড়া বলে। পুঁজ বৃদ্ধি পেলে ব্যথা, বেদনাও বাড়তে থাকে। পুঁজ বের করে দিলেই ব্যথা কমে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ধীরে ধীরে সেরে যায়। কিছু কিছু জায়গায় ফোঁড়া লালবর্ণ ধারণ করে বড় হতে থাকে। ভীষণ ব্যথা হয়। এগুলোকে বলা হয় বিষফোঁড়া। এই ফোঁড়া সারতে অনেক সময় লাগে। ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ খাওয়া এবং মলম লাগাবার ব্যবস্থা করতে হয়। অসতর্ক হলে বিষফোঁড়া থেকেও মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়। শরীরের সঞ্চিত বিষ বের করার জন্যই শারীরিক প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় এসব ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়। সাময়িক কষ্ট হলেও শরীর এভাবে দোষমুক্ত হয়।

শরীর দুর্বল হলে অনেক সময় শরীরের অভ্যন্তরে বিষফোঁড়া তৈরী হয়।

সময়মত অপারেশন করে বিষাক্ত রস বের করা না হলে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা থাকে।

শরীরের ভিতরে বিষফোঁড়া হলে জ্বর হয়। জ্বরের মাত্রা বাড়তে থাকলে সতর্ক হতে হবে। ডাক্তার দেখাতে হবে। জ্বর কমার পরও সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে।

শরীরের চামড়ার উপরে রোগ জীবাণুর আশ্রয়স্থলগুলো খোস, পাঁচড়া, ঘামাচি, ফোঁড়া, বিষফোঁড়া ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। এগুলোকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

অর্শ্ব ও ভগন্দর

মলদ্বারে বায়ু এবং রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হলে শিরা উপশিরাগুলো ফোলে উঠে গুটিকা সৃষ্টি করে। আঙ্গুরের গুচ্ছের মত এই গুটিকাগুলোতে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হতে থাকে। এই জন্য ব্যথা, জ্বালা এবং চুলকানি হয়। এগুলো ফেটে গিয়ে রক্তস্রাব হয়। এটিকে বলে অর্শ্ব। লিভার অসুস্থ হলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

গুহ্যদেশে বিষাক্ত ফোঁড়া হয়ে নালীতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তাকে বলে ভগন্দর (ফিসচুলা) এই নালী ঘা থেকে পুঁজ এবং রক্ত বের হয়। রোগী বসতে পারে না ব্যথা হয়। মলত্যাগের সময় খুব জ্বালা হয়।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ভগন্দর বেশী হয়। কারণ যেসব অঙ্গ শরীরের মল মূত্র বের করতে সাহায্য করে সেগুলো বয়সের কারণে ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। শরীরের সব দূষিত পদার্থ বের না হবার কারণেই অর্শ্ব ও ভগন্দর রোগ হয়।

আধুনিক চিকিৎসায় অপারেশন করে ক্ষতস্থান ঠিক করা হয়। খাদ্য এবং ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

টনসিল

গলনালী এবং মস্তিষ্কের প্রবেশ পথে থাকে টনসিল নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালন করে টনসিল। বায়ু এবং রক্তের সঙ্গে কোন দূষিত পদার্থ যাতে মস্তিষ্কের প্রবেশ করতে না পারে তা দেখাই হল টনসিলের প্রধান কাজ। সতর্ক প্রহরীর মত টনসিল এই কাজ করে।

লিভার, কিডনী, প্লীহা এবং ফুসফুস এই চারটি প্রধান অঙ্গ বায়ু এবং

রক্তকে শোধন করে বিশুদ্ধ রক্ত মস্তিষ্কে পাঠায়। কোন কারণে চারটির মধ্যে একটি বা একাধিক অঙ্গ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বায়ু এবং রক্তের শোধন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না তখন টনসিল বায়ু ও রক্ত শোধনের কাজটি করে।

টনসিল অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্বল হলে মস্তিষ্কের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে নানা কারণে টনসিলের অসুখ বেশী দেখা যায়। ঠাণ্ডা গরম আবহাওয়া বা খাদ্য ত্রুটির জন্য দুর্বলতার ফলে এরূপ হয়। ডাক্তার দেখাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

আর্থ্রাইটিস

সকালে ঘুম থেকে উঠলেই কোমর ভারী হওয়া বা ব্যথা হওয়া, হাঁটুতে ব্যথা, পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ব্যথা এগুলো হলো আর্থ্রাইটিসের অর্থাৎ বাতের লক্ষণ।

আর্থ্রাইটিস নানা ধরনের হয়। ভারতে প্রায় দশ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগছেন। বিশেষত বয়স্ক মানুষরাই এই রোগে বেশী ভুগেন।

পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। ধরনও হচ্ছে নানা রকমের। গেঁটে বাত শরীরের বিভিন্ন গেঁটে গেঁটে হয়। মহিলাদেরই গেঁটে বাত বেশী হয়। আগে যেকোন দীর্ঘস্থায়ী বাতকেই গেঁটে বাত বলা হত। এখন উপসর্গ অনুযায়ী বাত ভাগ করা হয়। চিকিৎসা এবং ঔষধের ধরনেও পার্থক্য থাকে।

গেঁটে বাতের শুরুতে অল্প জ্বর হয়, চোখ লাল হয়, ধীরে ধীরে ছোট ছোট গাঁটে ব্যথা শুরু হয়। অনেক সময় বংশগত কারণেও এই রোগ হয়। তাছাড়া মোটা মানুষের শরীরের চাপে গাঁটে গাঁটে বেশী ক্ষয় হয়। মধ্য বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রথমে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ব্যথা হয়ে লাল হওয়া এবং ফোলে উঠা, অল্প অল্প জ্বর হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কিছুদিন কষ্ট ভোগার পর মনে হয় রোগ সেরে গেছে। কিন্তু কয়েকমাস পরে আবার হঠাৎ করে আরো বেশী ব্যথা নিয়ে রোগ ফিরে আসে। পায়ের পাতা, পাতের কবজি, হাতের আঙ্গুলও আক্রান্ত হয়। রক্ত পরীক্ষা করে এবং গাঁটের এক্স-রে করে রোগ ধরা যায়। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা শুরু না করলে এ রোগ সহজে ভাল হয় না।

রক্তে ইউরিক এসিড বেড়ে গেলেও গেঁটে বাত হয়। প্রোটিন এবং ফ্যাট

অর্থাৎ চর্বি জাতীয় খাবার কম খেলে রোগের প্রকোপ কমে যায়। কিছু কিছু খাদ্য বন্ধ করে দিতে হবে যেমন- পাঁঠা বা খাসির মাংস, মদ, এবং যেকোন ধরনের গুরুপাক খাদ্য বাদ দিতে হবে।

শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইউরিক এসিড তৈরী হলে বা কিডনী অসুস্থ হয়ে পড়লে গেঁটে বাতের সমস্যা বেড়ে যায়। কিছু কিছু ঔষধের জন্যও ক্ষতি হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। ব্যথা কমানোর ঔষধ বা প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের ঔষধ বেশীদিন খাওয়া উচিত নয়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়।

গেঁটে বাতে ফিজিও থেরাপীতে কোন কাজ হয় না। ব্যথা কমানোতে একটু আরামবোধ করা যায়।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস

এটি একটু জটিল ধরনের আর্থ্রাইটিস। কিছুকাল আগেও গ্রামে এবং শহরে এই রোগের প্রকোপ বেশী ছিল। এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে হার্টের ভাল্ব নষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার কারণে এ রোগের প্রকোপ কমেছে।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সারে না। নিয়মিত ঔষধ খেতে হয়। বর্তমানে অনেক উন্নত মানের ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে রোগের প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে এবং চিকিৎসা শুরু হলে সম্পূর্ণ সেরে না গেলেও অনেক বেশী ভাল থাকা যায়। **চিকিৎসা সময়মত না করালে সারা জীবন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়।**

এই রোগে ব্যথা একটু বেশী হয়। বিভিন্ন গাঁটে ব্যথা ঘুরে ঘুরে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ব্যথা শরীরের দুদিকেই সমানভাবে হয় যেমন দুই হাঁটুতে, দুই গোঁড়ালীতে, দুই হাতের কব্জিতে, এবং কনুইতে একই সঙ্গে ব্যথা হয়। হাতের ছোট ছোট গাঁটেও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।

বেশী ব্যথা হলে বা ফোলে গেলে বরফের সেঁক দিতে হবে, ঔষধ খেতে হবে এবং বিশ্রামে থাকতে হবে।

আজকাল ফিজিওথেরাপি এবং আলট্রাসনিক রে দিয়ে ব্যথা কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এই রোগের ঔষধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশী হয়। তাই মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষা করাতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া

কোন ঔষধ খাওয়া চলবে না। কারণ ঔষধের পরিমাণ বেশী হলে লিভার এবং চোখ খারাপ হতে পারে।

এই রোগের চিকিৎসায় মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং অর্থোপেডিক সার্জেনের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়ার ফলেই এই রোগটি হয়। কিছু সাবধানতা মেনে চললে রোগের যন্ত্রণা এবং প্রকোপ কমানো যায় যেমন-

(১) ওজন ঠিক রাখা।

(২) হাঁটা চলার অভ্যেস ঠিক রাখা।

(৩) সহজপাচ্য মাছ খাওয়া।

(৪) নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা ইত্যাদি।

অল্প বয়সী মেয়েদের প্রায় একই ধরনের আর্থাইটিস হয়। ব্যথা, জ্বর, চোখ লাল, মুখে ঘা হয়, মাথার চুল পড়তে থাকে। সময়মত চিকিৎসা না হলে হার্ট, কিডনী, চোখে ও চামড়ায় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। দেরীতে ধরা পড়লে এ রোগ সহজে সারে না।

অস্টিওপেরোসিস

ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের জোর কমে গেলে এই রোগ সৃষ্টি হয়। অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। ভিটামিন ডি এবং পুষ্টিকর খাবারের অভাবেও এই রোগ হয়।

আগেকার দিনে বিধবাদের মধ্যে এহ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যেত। কারণ বিধবাদের খাদ্য মোটেই পুষ্টিকর ছিল না। অথচ কাজের চাপ ছিল বেশী। তাই অনেকেরই মধ্য বয়সে কোমর বেঁকে শরীরটা ধনুকের মত হয়ে যেতো। আধুনিককালের বিধবারা খাদ্যের ব্যাপারে সামাজিক শাসন এবং কুসংস্কার মুক্ত হবার ফলে এ রোগের প্রকোপ অনেকটা কমেছে।

এই রোগের আরেকটা কারণ হল মহিলাদের মেনোপোজ অর্থাৎ রজঃনিবৃত্তি। এই সময় শরীরের ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন ক্ষরণ বন্ধ হতে থাকে। ফলে মহিলাদের হাড়ের জোর কমে যায়। এই হরমোন ঔষধের আকারে খাওয়ার ফলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে।

অন্যান্য অনেক কারণেও অস্টিওপোরোসিস হতে পারে। যেমন -

(১) অলস জীবন যাপন করলে।

(২) দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ খেলে।

(৩) অপুষ্টিকর খাদ্য খেলে।

(৪) বেশী মাত্রায় মদ খেলে ইত্যাদি।

অস্টিও পোরোসিস রোগের প্রধান উপসর্গ হল কোমর ব্যথা। এই রোগে হাড়গোড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বিশেষতঃ কোমর, শিরদাঁড়া, হাতের কব্জি অল্প আঘাতেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

অস্টিও পোরোসিস ধরা পড়ে এক্স-রে করে। যারা এই রোগে ভোগেন তাদের কতকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেমন ঃ (১) উদ্বেগ প্রবণতা (২) অবসাদ (৩) ক্লান্তি (৪) ঘুম কম হওয়া (৫) মাংসপেশীতে ব্যথা (৬) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, (৭) মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

ভাল ঘুমের জন্য ঔষধ খেতে হয়। মানসিক অবসাদ বেশী হলে মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাতে হবে। ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি পাওযা যায় এমন খাদ্য বা প্রয়োজনে ঔষধ খেতে হবে।

মনে রাখতে হবে এটা কোন রোগ নয়। বয়সের কারণে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। পুষ্টিকর খাদ্য প্রতিদিন কিছু না কিছু খেতে হবে। প্রয়োজনে ঔষধ খেতে হবে। হাঁটা চলা একটু ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। মনটাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখতে হবে। এ রোগে ব্যথা হয় হাড়ে।

বয়স্ক মেয়েদের আরেক রকম ব্যথা হয় মাংসপেশীতে। পিঠে ও কোমরের পেশীতে ব্যথা, চলাফেরা করে। এই ব্যথায় হাড় ভাঙ্গার ভয় নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা হয়।

বড়দের হাঁপানী

হাঁপানী হয় শ্বাসনালীতে। তাই এটাকে শ্বাসরোগও বলা হয়। শ্বাসনালীতে কফ মিশ্রিত বায়ু জমলে শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। গলনালীর ভিতব দিয়ে ফুসফুসে বায়ু যেতে কষ্ট হয়। বায়ু প্রবেশের কষ্ট থেকে বুকে হাঁপ ধরে। এজন্য এ রোগের নাম হয়েছে হাঁপানী।

যেকোন বয়সে এ রোগ হতে পারে। বংশগত হলে রোগ সারতে দীর্ঘকালীন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। অন্যকোন কারণে হাঁপানী হলে প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা শুরু করা হলে রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

শ্বাসকষ্ট বিভিন্ন কারণে হয়- ব্রংকাইটিস হলে হয়, হাঁপানী থাকলে হয়, হার্টের সমস্যা থাকলে হয়, শুকনো কাশি থাকলে হয়। কাজেই প্রথমে সঠিক রোগটা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্বাসনালী এবং ফুসফুসকে ঘিরে যেসব রোগ হয় দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে শ্বাসনালীর বেশ ক্ষতি হয়ে যায়। এই ক্ষতি সহজে পূরণ করা যায় না।

হাঁপানী চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। এই ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশী হয়। এজন্য ডাক্তারের পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ নিয়মিত হওয়া দরকার। টেবলেট ব্যবহার করলে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। তাই পাপ মানে ইনহেলার ব্যবহার করা হয়। তাহলে শ্বাসনালী হয়ে সরাসরি ফুসফুসে ঔষধ চলে যায়। অন্য কোথাও প্রতিক্রিয়া হয় না।

(পাপ) ইনহেলার দুরকমের হয়। একটা রোগ সারায়, আরেকটা উপসর্গ কমায়। স্টেরয়েড কম ব্যবহার করে পাপ অর্থাৎ ইনহেলার ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়।

হাঁপানী হয় অ্যালার্জি থেকে। কোন একটা জিনিস শ্বাসনালী সহ্য করতে পারে না। ফলে শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ফল হল হাঁপানী। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যদি সাঁই সাঁই শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে হাঁপানী গভীর হয়েছে।

শিশুদের হাঁপানী বংশগত না হলে চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে যাবার আগেই চিকিৎসা বন্ধ করে দিলে কুড়ি পঁচিশ বছর পরও আবার হাঁপানী ফিরে আসে। তখন রোগ সারতে বহু সময় লাগে।

বংশগত এবং পরিবেশগত দুই ধরনের হাঁপানী হয়। চিকিৎসায় কিছুটা হেরফের হয়। কোন জিনিসে অ্যালার্জি হয় তা বুঝতে পারলে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। দুধ, ডিম, বেগুন, চিংড়ি মাছ, পুঁইশাক, ধুলা, বালি, ধোঁয়া ইত্যাদির প্রভাব বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অ্যালার্জির কারণ জানা যায়। তখন সেই বিশেষ দ্রব্যটির ব্যবহার বন্ধ করলে রোগী ভালো থাকে।

কুষ্ঠরোগ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগকে এক ধরনের চর্মরোগ বলে গণ্য করা হয়। আয়ুর্বেদ মতে ১৮ রকমের কুষ্ঠরোগ আছে। আধুনিক মতে কুষ্ঠরোগ প্রধানত দুই রকমের হয়। (১) সংক্রামক (২) অসংক্রামক।

যে কুষ্ঠরোগ শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে সেটাই হল সংক্রামক কুষ্ঠ। রক্ত ও পুঁজের মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সতর্কতার সঙ্গে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখতে হবে।

এই রোগ আক্রমণের প্রথম লক্ষণ আক্রান্ত স্থানের চামড়া সাদা ফ্যাকাসে হয়ে যায়, স্পর্শ করলে বোধশক্তি কম মনে হয়।

এই রোগের **প্রথম আক্রমণ** হয় পায়ে। পরে নাকে, কানে, মুখে এবং ক্রমশঃ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানের লোম ঝরে যায়। **দ্বিতীয় স্তরে** শরীরে জ্বর জ্বর ভাব, ব্যথা, দুর্বলতা, অকারণে প্রচুর ঘাম হওয়া, মাথায় যন্ত্রণা, চুল ঝরে পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

তৃতীয় স্তরে শরীরের নানাস্থানে ব্রণ সৃষ্টি হয়। স্নায়ুতে সুচ ফোটার মত যন্ত্রণা হয়, নাক, কান, কপাল, গাল ইত্যাদির চামড়া সংকুচিত হয়ে সামান্য ফুলে উঠে।

চতুর্থ স্তরে আক্রান্ত স্থানের বোধশক্তি লোপ পায়। শরীরে লাল লাল চাকা দাগ দেখা দেয়। হাতের ও পায়ের আঙ্গুল খসে পড়ে। নাক ও মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়।

শরীরের অশোধিত রক্তে জীবাণুর আক্রমণে রোগ বিষ তৈরী হয়। ক্রমে রক্ত ও চর্মকে দূষিত করে এই রোগের প্রকাশ ঘটে।

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ধারণা হল দূষিত মাছ থেকেই কুষ্ঠ জীবাণু মানব শরীরে প্রবেশ করে। ভারতেও দেখা যায়, মৎস্যপ্রিয় মানুষদের মধ্যেই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বেশী।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত ধরনের ঔষধ আবিষ্কার করেছে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারলে সুফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের কুষ্ঠ রোগের মধ্যে সংক্রামক ধরনটিই মারাত্মক। অসংক্রামক কুষ্ঠ রোগ মৃত্যুর কারণ হয় না। তেমন যন্ত্রণাদায়কও হয় না।

শ্বেতকুষ্ঠ সংক্রামক নয়। শরীরের মেদ, মাংস ও রক্তে শ্বেতকুষ্ঠ সীমাবদ্ধ থাকে। চামড়া সাদা হয়ে শরীরের চেহারায় বিকৃতি ঘটায়। শরীরের চামড়ায় যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি আছে তা কুষ্ঠ জীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। দূষিত রক্তই এই রোগের মূল কারণ। অনেক সময় দেখা যায় কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে পাইওরিয়া রোগ থাকে।

পাইওরিয়া

দাঁতের গোড়ায় নরম মাড়ীতে দূষিত রক্ত জমে পুঁজ সৃষ্টি হয়। তাকেই বলে পাইওরিয়া। পাইওরিয়ার দূষিত পুঁজ পেটে গিয়ে আবার রক্ত দূষিত করে। শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে এই রোগ সৃষ্টি হয়। মাড়ী নষ্ট করে। দাঁত অকালে ঝরে পড়ে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের মতে দীর্ঘকালীন পাইওরিয়া রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে দূষিত রক্ত ও পুঁজ থেকে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু সৃষ্টি হয়। আধুনিক গবেষকরা এবিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি।

দন্তরোগ

দাঁতের সঙ্গে শরীরের জীবনীশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দাঁত দেখেই বুঝা যায় স্বাস্থ্যবান অথবা স্বাস্থ্যহীন কিনা। ডাক্তার এসে প্রথমে দাঁত, জিহ্বা এবং নাড়ী দেখেন। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা বুঝতে এই পরীক্ষার দরকার হয়।

স্বাস্থ্যবান মানুষের দাঁতগুলো থাকে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে সাজানো। জিহ্বাও থাকে পরিচ্ছন্ন।

স্বাস্থ্য নষ্ট হলে বা অসুস্থ হলে দাঁতের বর্ণ বদলে যায়। শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকলে দন্তরোগের সৃষ্টি হয়। মাড়ী দুর্বল হয়। দাঁতের যত্ন নিলে পাইওরিয়া রোগ হতে পারে না। দাঁত ভাল থাকলে খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া যায়। খাদ্য সহজে হজম হয়। শরীর ভাল থাকে। মুখের হাসিও সুন্দর হয়।

মেদ রোগ

শরীরের পক্ষে মেদ অর্থাৎ চর্বি অত্যাবশ্যক। চর্বি শরীরের তাপ রক্ষা করে। দেহ তুলার মত নরম রাখে বলেই শরীরের চলাচল সহজ হয়। পায়ের তলায় চর্বি না থাকলে চলাফেরা করা সহজ হতো না। চেয়ারে বসতে গেলে চর্বির প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝা যায়। মাংসপেশীতে এবং হাড়ের সন্ধিস্থানে চর্বি থাকে বলেই দেহযন্ত্র সঠিকভাবে চলতে পারে। নারী দেহে চর্বির বেশী প্রয়োজন হয়। সন্তান ধারণ এবং পালনের জন্যও চর্বির প্রয়োজন।

কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত চর্বি শরীরে জমা হলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি অতিরিক্ত চর্বি শরীরের স্বাভাবিক সক্রিয়তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মেদবহুল শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। হার্ট এবং ফুসফুসের কাজ সঠিকভাবে চলতে পারে না। রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ, ডায়াবেটিস রোগের আক্রমণ হয়। সঠিক খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে মেদ ঠিক রাখতে হয়। বেশী খাওয়া এবং পরিশ্রমের অভাবই মেদ বৃদ্ধির প্রধান কাজ।

পক্ষাঘাত

পক্ষাঘাত মানে অবশ হয়ে যাওয়া। শরীরের কোন একটি বা একাধিক অঙ্গ অবশ হয়ে গেলে শরীর আংশিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এটা একটা স্নায়বিক রোগ।

শরীরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। মানুষের মন ও বুদ্ধির আবাসস্থল মস্তিষ্ক। শরীরের যাবতীয় কাজ মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো ২টি করে আছে। একটি অচল হলে দ্বিতীয়টি কাজ চালিয়ে নিতে পারে। দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি ফুসফুস, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য নাকে দুটি ছিদ্র, দুটি কিডনী, দেহের প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কটি দুই ভাগে বিভক্ত। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় যন্ত্রগুলো মানব শরীরের এক অসামান্য সৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

মস্তিষ্ক থেকেই বিভিন্ন স্নায়ুর সাহায্যে আমাদের বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, স্মৃতি শক্তি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সাহায্যেই দেহের যাবতীয় যন্ত্রের কাজ পরিচালিত হয়।

দেহের যেকোন স্নায়ু কোষ অকর্মন্য বা অক্ষম হয়ে গেলে মস্তিষ্কের নির্দেশ বহনকারী নাড়ীগুলো অবশ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে পক্ষাঘাত।

জিহ্বা যদি নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় বা জড়তা দেখা দেয় এবং জিহ্বা বের করলে তা যদি বেঁকিয়ে যায় তবে পক্ষাঘাত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়মত সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে সুফল পাওয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা

তলপেটে ভার ভার বোধ হওয়া, সময়মত পায়খানা না হওয়া, মলত্যাগে কষ্ট হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা বোধ, মাথা ধরা, জিহ্বায় ময়লা জমে থাকা, মুখে দুর্গন্ধ হওয়া ইত্যাদি হল কোষ্ঠবদ্ধতার প্রধান লক্ষণ।

আয়ুর্বেদ মতে কোষ্ঠবদ্ধতা হল দেহের প্রধান প্রধান রোগের উৎপত্তির মূল

কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে অন্ত্রে মল পচে বিষাক্ত হয়। এই বিষ রক্ত দূষিত করে। বিষাক্ত মলে নানা রোগ জীবাণুর জন্ম হয়। রক্ত দূষিত হলে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কোষ্ঠবদ্ধতার মূল কারণগুলো হল- (১) খাদ্য ও পথ্যের ত্রুটি, (২) অতিরিক্ত চা-কফি, তামাক বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ (৩) শ্রম বিমুখতা (৪) অতিভোজন (৫) ঔষধের প্রতিক্রিয়া (৬) চর্বি জাতীয় মশলাযুক্ত খাবার অসময়ে বেশী খাওয়া ইত্যাদি। কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার প্রধান উপায় হল খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা, পরিমিত খাবার, পরিমিত বিশ্রাম এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ খাওয়া।

একশিরা

রক্তের সার ভাগের নাম হল শুক্র। এই শুক্রই শরীরের সমস্ত অঙ্গের শক্তি যোগায় এবং নতুন মানুষের জন্ম দেয়। রক্তবাহী ধমনীগুলোর পাশে পাশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা নালী আছে। রক্ত পরিস্রুত হয়ে শুক্র উৎপন্ন হলে শুক্রবাহী নালীপথে প্রবাহিত হয়ে দেহের সমস্ত যন্ত্রকে ও গ্রন্থিগুলোকে পুষ্ট করে এবং প্রাণকোষ তৈরী করে অণ্ডকোষে সঞ্চিত করে।

স্বাভাবিক নিয়মে অণ্ডকোষের সঞ্চিত শুক্র বের হবার পথ না পেলে বিকৃত হয়ে পড়ে। রক্তে দূষণ থাকলে শুক্ররস থেকে দূষিত জল উৎপন্ন হয় এবং অন্তকোষ ফোলে উঠে। তীব্র ব্যথা হয়। এই অবস্থাকে বলে একশিরা। ঔষধে ভাল না হলে অনেক সময় অপারেশন করে দূষিত জল বের করতে হয়।

হার্নিয়া

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হার্নিয়াকে বলে অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ। শরীরের দূষিত রক্ত অন্ত্রের কোন অংশের স্ফীতির কারণ ঘটালে বা অন্য কোন নাড়ীর স্বস্থান থেকে বিচ্যুতি ঘটালে অংশটি নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে চলে আসে। এই অবস্থাকে বলে হার্নিয়া।

তলপেটের অবরণীতে কয়েকটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র পথে কোন নাড়ী নেমে আসলে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় ইনগুইনাল হার্নিয়া। তলপেটের যে ছিদ্রপথে পায়ের ধমনী রয়েছে সেই পথে কোন নাড়ী বেরিয়ে আসলে তাকে বলে ফেমোরাল হার্নিয়া। শিশুদের নাভিপথে নাড়ী বেরিয়ে আসলে তাকে বলে অ্যামবিলিক্যাল হার্নিয়া।

হার্নিয়ার তিনটি অবস্থা আছে। (১) নাড়ি বেরিয়ে আসলে হাত দিয়ে ঠেলে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায়। এটাকে বলে রিডিউসিবল হার্নিয়া। (২) বাইরে আসা নাড়ী যদি শক্ত হয়ে যায় তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায় না। এই অবস্থাকে বলে ইররিডিউসিবল হার্নিয়া। (৩) বাইরে আসা নাড়ী যখন ফোলে গিয়ে গুহ্যদ্বারের আংটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাকে বলে স্ট্র্যাংগলড হার্নিয়া। এই তৃতীয় অবস্থাটি হল বেশী বিপজ্জনক। মলদ্বার বন্ধ হলে মল মুখ দিয়ে বমির আকারে বেরিয়ে আসে। রক্ত চলাচলে বন্ধ হয়। তখন একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন করে হার্নিয়া সরাবার ব্যবস্থা করা।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণেও হার্নিয়া সৃষ্টি হয়। মল পূর্ণ অন্ত্রের উপর চাপ পড়লে অন্ত্রের অংশ বেরিয়ে আসে।



দেহের অভ্যন্তর ভাগ

মানসিক রোগ

আমরা যা চাই তা পাই না, আবার যা পাই তা চাই না। এমন একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আমরা বসবাস করছি। তাই নানা কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অশান্তি, অতৃপ্তি আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকে।

দীর্ঘকালীন মানসিক চাপ থেকে শরীরে ছোট বড় অনেক ধরনের কঠিন রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন পেট খারাপ, লিভার খারাপ, ব্লাড প্রেসার, হার্টের নানা রোগ সেই সঙ্গে মানসিক রোগ। এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে মানসিক চাপ থেকে।

মানসিক চাপের দুটি দিক থাকে। (১) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি (২) ব্যক্তি বিশেষের সহ্য ক্ষমতা। সহ্য ক্ষমতা একেকজন মানুষের একেক রকম হয়। তাই সামাজিক পরিবেশে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে। কোনটা কিভাবে সহ্য করতে হবে তা স্থির করতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে অশান্তি হয় পরিবারে আবার অনেক ক্ষেত্রে অশান্তি হয় কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক পরিবেশে। কোথায় কিভাবে আচরণ করলে মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে তা ব্যক্তি নিজেই স্থির করতে পারেন।

আজকাল মানসিক চাপ কমানোর পরামর্শ দেবার ক্লিনিক গড়ে উঠছে সবরকম শহরে। তাতে বুঝা যায় মানসিক রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পরামর্শ দাতারা সকলেই যে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ তা নয়। তবুও পেশাদার পরামর্শদাতারা কিছু জ্ঞান অর্জন করেই ক্লিনিক খুলছেন তা আশা করা যায়।

তবু ঘরে ঘরে যেহেতু মানসিক চাপ বাড়ছে তাই সবাইকে যথাসম্ভব নিজস্ব উদ্যোগে মনকে শান্ত রাখার কিছু ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। প্রথমতঃ কিছু হাল্কা ধরনের ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে যেমন একটানা ৩০ মিনিট হাঁটা। সঙ্গে কিছু খালি হাতে ব্যায়াম। বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যায়ামের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে। পরিমিত ব্যায়াম খুব উপকারী কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম ক্ষতিকর এই সরল কথাটা মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যেকোন পছন্দের জিনিস নিয়ে একটু সময় ভাবনাচিন্তা করা ভাল।

তাতে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, গল্প করা, আড্ডা দেওয়া, লেখালেখি করা ইত্যাদি কাজে মনকে নিযুক্ত করা দরকার।

তৃতীয়তঃ হাল্কা সহজপাচ্য খাবার খাওয়া। যাদের পান খাবার অভ্যেস আছে দিনে দুবার খাওয়ার পর দুটির বেশী পান খাওয়া ঠিক নয়। দোক্তা একেবারে বাদ দিতে হবে। দোক্তা থেকে ক্যান্সার হয় তা প্রমাণিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম ও ঘুম শরীর ও মনকে সুস্থ ও শান্ত রাখে এটা বিশেষভাবে প্রমাণিত। ভাল ঘুম না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অল্প পরিমাণে ঘুমের ঔষধ খাওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের সামর্থে সীমাবদ্ধতা আছে এটা মেনে নিতে হবে।

অনিদ্রা

অনিদ্র অর্থাৎ ভাল ঘুম না হওয়া একটি মাত্র রোগ নয়। নানা কারণে অনিদ্রা রোগের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন -

(১) অত্যধিক টেনশনের জন্য।

(২) বদহজম সহ পেটের কিছু গণ্ডগোলের জন্য।

(৩) হাঁপানী রোগের জন্য।

(৪) অতিরিক্ত কৃমির জন্য।

(৫) অতিরিক্ত মদ বা চা কফি সিগারেটের জন্য।

(৬) স্নায়ুবিক দুর্বলতার জন্য।

(৭) দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বা মানসিক শোকের জন্য।

(৮) দীর্ঘকালীন কোন রোগের জন্য।

(৯) বাতের আক্রমণের জন্য।

(১০) ব্লাডপ্রেসার বা ডায়াবেটিসের জন্য।

(১১) উদ্ভট কোন চিন্তাভাবনার জন্য।

ইত্যাদি নানা কারণের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। দীর্ঘদিন অনিয়মিত ঘুমের কারণে স্থায়ী অনিদ্রা রোগ দেখা দিতে পারে।

অনিদ্রা রোগের বিভিন্ন ঔষধে বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। ঔষধ ছাড়াই ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনিদ্রা রোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রথমতঃ ডাক্তার দেখিয়ে বুঝে নিতে হবে শরীরে কোন ধরনের জটিল রোগ আছে কিনা। রোগ ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসা হলে অনিদ্রা রোগ থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, হতাশা মন থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে নানা কাজে নিযুক্ত রাখলে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা যায়।

তৃতীয়তঃ খোলামেলা কথাবার্তা, আড্ডা দেওয়া, গল্প করা, গান গাওয়া, বা শোনা, টিভি দেখা, হাঁটা, হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করা, সময়মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়া, সুগন্ধী ধুপকাঠি, বা ফুল বিছানার পাশে রাখা, সেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা নিয়ে শান্ত মনে কোন ভাল বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে খুব সহজেই ঘুমিয়ে পড়া যায়।

এভাবে অনিদ্রা রোগ সারাতে পারলে শরীর ও মন সুস্থ থাকবে ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যাবে। বেশী ঔষধ খেলে অন্য কোন রোগ সৃষ্টি হতে পারে। ঘুমের ঔষধে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলে অনিদ্রা রোগ সহজে সারে না। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দিনে ও রাতে মিলে ২৪ ঘন্টার মোট ৮ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। বয়স্কদের ক্ষেত্রে একটু কম হলে ক্ষতি নেই।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিসকে বলা হয় সাইলেন্ট কিলার। অর্থাৎ রোগী নিজে বুঝতেই পারে না শরীরে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এই রোগ সময়মত ধরা না পড়লে এবং দীর্ঘদিন চলতে থাকলে হার্ট, কিডনী, চোখ এবং স্নায়ুর প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যায়। চোখ অন্ধ হয়ে যায়। কিডনী অচল হয়ে যায় হার্ট কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কাজেই এ রোগ সম্পর্কে শুরুতে সতর্ক হতে হবে।

ডায়াবেটিস এখন প্রায় ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে। বিশেষতঃ কর্মব্যস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ এবং বিত্তবানরা বেশী আক্রান্ত হচ্ছে। সারা বিশ্বে এই রোগের প্রবণতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো হল ঃ (১) ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া, (২) ঘনঘন পিপাসা পাওয়া, (৩) মাথা ঘোড়া, (৪) বারবার ফোড়া বা কার্বংকল হওয়া, (৫) চোখে ঝাপসা দেখা (৬) শরীরের দুর্বলতা (৭) কোন কাজে মনোযোগ দিতে না পারা, (৮) শরীরের ওজন কমে যাওয়া, (৯) শরীরে চুলকানি, (১০) শরীরের কাটা বা ঘা শুকাতে বেশী সময় লাগা, (১১) বারবার পায়খানা ইত্যাদি।

ডায়াবেটিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁড়িয়েছে সুগার নামে। কারণ রক্তে সুগার বেড়ে গেলেই ডায়াবেটিস হয়। খাদ্য থেকে চিনি এবং চিনি থেকে গ্লুকোজ তৈরী

হয়। এই গ্লুকোজ কোন কারণে শরীরের কোষে ঢুকতে না পারলে রক্তে জমে উঠে। এই অবস্থার নামই ডায়াবেটিস বা সুগার। ইনসুলিন নামে একটা হরমোনের অভাবে এই রোগের সৃষ্টি হয়। প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর চিনি এবং লবণ বেরিয়ে যায়। তাই ঘনঘন পিপাসা দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস হলে শরীরের কোষের ভেতর গ্লুকোজ বা সুগার কমে যায়। কোষের বাইরে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ বা সুগার বেশী বেশী জমে যায়। বারবার প্রস্রাবের সঙ্গে কিছু গ্লুকোজ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তার পরেও রক্তের মধ্যে যে গ্লুকোজ থাকে তা রক্তকে ঘন করে দেয়। এর ফলে রক্তের কোলেস্টেরল রক্তনালীর গায়ে জমে যায়। এতে একদিকে রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায় অন্যদিকে সূক্ষ্ম ছোট ছোট রক্তনালীগুলো নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। আয়ু কমতে থাকে।

শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন তৈরী হয়। যেমন মাথায় পিট্যুইটারী, গলায় থাইরয়েড, পেটে প্যানক্রিয়াস ইত্যাদি গ্রন্থির হরমোন শরীরের বিভিন্ন কাজ করে। পিট্যুইটারিতে উৎপন্ন হরমোন শরীর বাড়তে সাহায্য করে। এই হরমোনের অভাব হলে মানুষ ছোট আকৃতির অর্থাৎ বামন হয়। হরমোন বেশী হলেও ক্ষতি। শরীর মেদবহুল হয়।

প্যানক্রিয়াসে উৎপন্ন পিত্তরস খাদ্য হজম করায়। আগুনের মতো শক্তি সৃষ্টি হয় এই পিত্তরসে আবার এই গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয় একটা হরমোন যার নাম ইনসুলিন। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে এই ইনসুলিন। এর অভাবে শরীরটা হয় ডায়াবেটিস রোগী।

ডায়াবেটিস অনেক ধরনের হয়। বংশগত কারণে ডায়াবেটিস হলে তা সহজে সারে না। সারা জীবন সতর্ক থাকতে হয়। নিয়মকানুন মেনে খাদ্য এবং ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেলে অনেকটা ভাল থাকা যায়।

৫ থেকে ১৫ বছরের শিশু বা কিশোরদের যে ডায়াবেটিস হয় তাকে বলা হয় **টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস**। অনেকের ক্ষেত্রে শরীরে ইনসুলিন খুব কম থাকে। তাই তাদের শুরুতেই ইনসুলিন দিতে হয়।

বয়স্কদের যে ডায়াবেটিস হয় তাকে বলে **টাইপ টু ডায়াবেটিস**। খাদ্য ঔষধ ব্যায়াম বিশ্রামের নীতি অনুসরণ করে এরা ভাল থাকেন। অসতর্ক হলে চোখ, কিডনী, হার্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

গর্ভবতী মহিলাদের ডায়াবেটিস যদি বংশগত না হয় তবে প্রসবের পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও ডাক্তারের পরামর্শমত খাদ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে ডায়াবেটিস সেরে যেতে পারে।

শরীরে হরমোনের গণ্ডগোলের কারণেও এক ধরনের ডায়াবেটিস হতে পারে। হরমোনের চিকিৎসা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে হলে তা সেরেও যেতে পারে।

কোন কোন ঔষধের পার্শ্বক্রিয়ার ফলে এক ধরনের ডায়াবেটিস হয়। সেই ঔষধটি বন্ধ করে দিলে ডায়াবেটিস সেরে যেতে পারে।

অনেকের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস সাময়িকভাবে সেরে যায় আবার কয়েক বছর পর ডায়াবেটিস ফিরে আসে। তখন বুঝতে হবে ডায়াবেটিস সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে সারা জীবন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

শরীরের ওজন হঠাৎ করে কমে গেলে যেকোন বয়সেই রক্তের সুগার পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

যারা দশ-পনেরো বছর ডায়াবেটিস রোগে ভুগেন তাদের প্রথমেই চোখের সমস্যা অর্থাৎ দৃষ্টিহীনতা দেখা দেবে। এমনকি হঠাৎ করে অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে। চোখের রেটিনার সূক্ষ্ম শিরাগুলো ফেটে গিয়ে রক্ত জমা হয়। ঔষধে সারে না। আধুনিক লেসার চিকিৎসায় কিছুটা উপশম হতে পারে।

চোখের পরেই ডায়াবেটিস রোগীর কিডনীর বিপদ বাড়তে থাকে। মূত্রের সঙ্গে অ্যালবুমিন বেরিয়ে যায়। সাধারণ পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে না। কিডনীর কোষ পরীক্ষা করে জানা যায় যে কিডনীর সূক্ষ্ম জালিকার রক্ত শোধন করার ক্ষমতা কমে গেছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বিপদ হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীর হার্টের সমস্যা বেশী হয়। রক্তনালীর সমস্যার জন্য করোনারি ধমনির রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, হার্ট ব্লক হতে পারে, হার্ট ফেলিওর হতে পারে।

চোখ, কিডনী, হার্ট ছাড়াও ডায়াবেটিসের রোগী পায়ের স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়। পা ঝিন ঝিন করে, অসার বোধ হয়, ঠাণ্ডা গরমের অনুভূতি কমে যায়। পায়ের শক্তি কমে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পায়ের পাতা ও আঙ্গুলে অসারত্ব বোধ, দু'পায়ে জ্বালা যন্ত্রণা দেখা দেয়। কোথাও কাটা গেলে বা ঘা হলে সহজে ভাল হয় না। সময় মত সতর্ক হলে চিকিৎসায় উন্নতি হতে

পারে। সময়মত বলতে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা শুরু করা।

ডায়াবেটিস রোগীর আরেকটি লক্ষণ হল - মাথা ঘোরা। রাত্রিবেলায় পাতলা পায়খানা করা, পেট ফোলে থাকা, বমির ভাব থাকা, প্রস্রাব মূত্রনালীতে জমে থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাবের বেগ না হওয়া ইত্যাদি।

ডায়াবেটিস রোগীর হাতের বুড়ো আঙ্গুল শুকিয়ে ব্যথা হতে পারে। হাতের উপরের দিকের মাংসপেশী শুকিয়ে ব্যথা হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীর বিভিন্ন রকম চর্মরোগ হয়। ফোড়া, কার্বাংফল, ক্ষত ইত্যাদি বারে বারে হতে পারে।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশী থাকলে শরীরে যেকোন জীবাণু প্রবেশ করে জাঁকিয়ে বসতে পারে। রোগ সারতে অনেক সময় লাগে এবং নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়ার আক্রমণ হলে জটিলতা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নেওয়া হঠাৎ বন্ধ করে দিলে বা ঔষধের মাত্রা কম ব্যবহার করলে বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশী খেলে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু না করলে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বয়স্ক ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গলে এবং শরীরের জলীয় ভাগ কমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করতে পারলে প্রাণহানি ঘটতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগী ঔষধের মাত্রা বেশী খেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শরীরে ঘাম হবে, মুখের কথা জড়িয়ে যাবে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। দ্রুত ডাক্তার না দেখালে বিপদ হতে পারে।

পৃথিবীর সব দেশেই ডায়াবেটিস টাইপ টু রোগীর সংখ্যা বেশী। ফলে ভবিষ্যতে বংশগত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এতকাল যাবৎ ৪০ বছরের বেশী বয়সে ডায়াবেটিস টাইপ টু রোগীর আক্রমণ শুরু হতো। এখন ফাস্টফুডের যুগে অনেক কম বয়সেও টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে। যদিও এটি জীবাণুঘটিত রোগ নয়, তবু খাদ্য ও জীবনযাত্রার অস্বাভাবিকতার কারণে অনেকের এই

রোগ হচ্ছে। কায়িক পরিশ্রম না করা বা কম করাও এই রোগে আক্রান্ত হবার একটি প্রধান কারণ।

ডায়াবেটিস টাইপ টু রোগীর সংখ্যা পৃথিবীর সব দেশেই বাড়ছে প্রথমতঃ বংশগত এবং দ্বিতীয়তঃ জীবনযাত্রা প্রণালী, অতি ভোজন এবং অতিমাত্রায় ফাস্টফুডের ব্যবহার এই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে ভোগ বিলাসের নতুন নতুন উপকরণ বাজারে আসছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের লোভ এবং প্রলোভন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল -

১) ছোটবেলা থেকে সুস্থ সুষম খাদ্যাভ্যাস তৈরী করতে হবে।

২) জীবনযাত্রায় সংযম ও সংযত ব্যবহার অভ্যাস করতে হবে।

৩) ভারতীয় খাদ্যরীতি যা বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফসল তা অনুসরণ করা উচিত।

৪) বেশী পরিমাণে টাটকা শাকসব্জি ও ফল খেতে হবে। স্থানীয় সস্তা দামের মরসুমী ফল খাওয়াই উপকারী।

৫) ফ্যাট জাতীয় খাবার খুব কম খেতে হবে।

৬) প্রতিদিন নিয়ম করে ৪৫ মিনিট হাঁটা ও ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হবে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যায়াম ঘুরে ফিরে করা যায় তাহলে একঘেয়েমি থাকবে না।

৭) কায়িক পরিশ্রম যতটা সম্ভব করা দরকার। নিজের কাজ নিজে করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করা উচিত।

৮) সারাদিন এক জায়গায় শুয়ে বসে কাটানো উচিত নয়।

৯) বাচ্চাদের নিয়ে আউটডোর গেম খেলা দরকার।

১০) কম্পিউটার নিয়ে একাদিক্রমে কাজ না করে মাঝে মাঝে খোলা জায়গায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আড্ডা দেবার সুযোগ না থাকলে ঘুরেফিরে কিছুটা সময় মানসিক বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের চারটি বিশেষ ধারার কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

১) নিয়মিত শরীর ও রক্তের পরীক্ষা করা

২) প্রয়োজনীয় ঔষধ বা ইনসুলিন নিতে ভুল না করা।

৩) সহজপাচ্য টাটকা খাবার ও ফল খাওয়া

৪) নিয়মিত ব্যায়াম, পরিশ্রম, হাঁটা দৈনিক ৪৫ মিনিট।

৫) ডায়াবেটিস রোগে কি কি ক্ষতি হতে পারে তা মনে রাখা যেমন- হার্ট, কিডনী, চোখ, হাতে পায়ে কাটা বা ঘা হলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ডায়াবেটিস রোগীরা তাড়াতাড়ি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা থাকলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

আজকাল ডায়াবেটিস রোগের খুব ভালো ভালো ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। ইনসুলিন ইনজেকশনের পরিবর্তে টেবলেটও শীঘ্রই বাজারে পাওয়া যাবে। মেদবহুল শরীর থেকে মেদ কমিয়ে নেবার জন্য সার্জারীর ব্যবস্থাও হয়েছে।

অনেক সময় ডায়াবেটিস রোগের কোন উপসর্গ দেখা যায় না। অথচ শরীরে ডায়াবেটিস রয়েছে। বিশেষ করে বংশগত রোগীর ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়। পরিবারে বয়স্কদের মধ্যে কারো ডায়াবেটিস দেখা গেলে অন্যদেরও রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল।

এতকাল ডায়াবেটিস ধরা পড়লেই ডাক্তাররা একটা খাদ্য তালিকা দিয়ে বলতেন এগুলো একদম খাওয়া চলবে না। মাটিরতলার কোন জিনিস খাওয়া যাবে না এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করার মত কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বহুকাল যাবৎ যে সংস্কার প্রচলিত রয়েছে তার থেকে ডাক্তারবাবুদের অনেকেই সহজেই মুক্ত হতে পারেন না। বহু অবৈজ্ঞানিক ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এজন্যই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলেরই কিছু ধারণা থাকা দরকার।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে ডায়াবেটিস রোগীরা সব কিছুই খেতে পারবেন তবে পেটের অবস্থা বুঝে কম পরিমাণে খেতে হবে। কারণ হজম শক্তির ক্ষমতা বিভিন্নজনের বিভিন্নরকম। সেদিকটায় সবসময় নজর রাখতে হবে। রোগী এবং চিকিৎসক তা ঠিক করবেন। চারপাশের অসংখ্য উপদেষ্টার উপদেশের প্রতি গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। নিয়ম মেনে চলছেন কিনা সেটা নিজেই যাচাই করুন। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে ডায়াবেটিস রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এ বিষয়ে সমাজে নানা ধরনের সংস্কার প্রচলিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মানুষের জ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে।

ব্লাডপ্রেসার

ডায়াবেটিসের মতই আরেক আধুনিক রোগ হল ব্লাডপ্রেসার। প্রাচীন আয়ুর্বেদে সন্ন্যাস রোগের কথা বলা হয়েছে। ব্লাডপ্রেসারের স্ট্রোকের সঙ্গে সন্ন্যাস রোগের মিল আছে। আগে এ ধরনের রোগের প্রকোপ ছিল খুবই কম। আধুনিক যুগে খাদ্য এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে ব্লাডপ্রেসারের রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে।

ব্লাডপ্রেসারকে বলা হয় সাইলেন্ট কিলার। এ রোগ নীরবে মৃত্যু ডেকে আনে। ডায়াবেটিসের কিছু উপসর্গ আছে যা রোগীকে সতর্ক হবার সুযোগ দেয়। কিন্তু ব্লাডপ্রেসারের বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা দেয় না, যাতে রোগী সতর্ক হতে পারে। অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন। হঠাৎ কোনও কারণে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ব্লাডপ্রেসার ধরা পড়ে।

বহুকাল যাবৎ ডাক্তারদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছিল। কোন অবস্থাকে ব্লাডপ্রেসার বলা হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন রকম। জীবনযাত্রাও আলাদা ধরনের। তাছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাই সারা বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশে মানব শরীরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠে। সব রোগের ক্ষেত্রেই এখন আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে এখন জানা গেছে যে একজন সুস্থ মানুষের ব্লাডপ্রেসার সাধারণত ১২০/৮০ পর্যন্ত থাকে। এর বেশী হলে হাই ব্লাড প্রেসার এবং এর নীচে থাকলে লো ব্লাড প্রেসার বলে গণ্য করা হয়। সারা বিশ্বের হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন।

ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্রটিও আধুনিক যুগেরই সৃষ্টি। এই যন্ত্র আবিষ্কারের আগে রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করেই চিকিৎসার কাজ চলতো। আজো নাড়ি পরীক্ষা একটি জরুরী বিষয়। কিন্তু এই নাড়ির গতি দেখে ব্লাডপ্রেসারের সঠিক পরিমাপ করা যায় না। ব্লাডপ্রেসারের ফলেই যে সন্ন্যাস রোগের মৃত্যু ঘটতো এটাও আধুনিক যুগেরই আবিষ্কার।

অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে উপরের প্রেসার অর্থাৎ ডাক্তারি ভাষায়

যাকে সিস্টোলিক প্রেসার বলা হয় সেটার চেয়ে নীচের প্রেসার যাকে ডায়াস্টোলিক বলা হয় সেটা অধিকতর বিপজ্জনক।

কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল যে উপর ও নীচের দুটি ব্লাডপ্রেসারের গুরুত্ব সমান। ডায়াস্টোলিক প্রেসারে হার্টের রক্তনালী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে হাই প্রেসার এবং লো প্রেসার দুটি থেকেই বিপদ সৃষ্টি হয়।

ব্লাডপ্রেসার কখনো একরকম থাকে না। পরিশ্রমের সময় একরকম এবং বিশ্রামের সময় অন্যরকম। সকালে একরকম এবং বিকালে অন্যরকম, একরকম হতে পারে। তবে হঠাৎ করে খুব বেশী প্রেসার ধরা পড়লে চিকিৎসা শুরু করতেই হবে। তারপর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ঔষধের ধরন এবং ডোজ ঠিক করতে হবে।

কয়েকদিন পরপর বারেবারে ব্লাডপ্রেসার মেপেও যদি প্রেসার ১২০/৮০ থেকে বেশী পাওয়া যায় তবে সেই ব্যক্তিকে ব্লাডপ্রেসারের রোগী বলে গণ্য করতে হবে। ব্লাডপ্রেসারের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। তাই সারা জীবন সুষম খাদ্য, ঔষধ এবং জীবনযাত্রার নিয়ম মেনে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

মানুষের শরীরে চোখ থেকে নখ পর্যন্ত প্রতিটি অংশে অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় জীবনী শক্তির রসদ যোগায় রক্ত। শরীরের সব অংশ থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেবার কাজটিও করে রক্ত। রক্ত প্রবাহ সঠিকভাবে না চললে জীবন রক্ষা করা যায় না।

মানুষের জীবন একবারও না থেমে চলতে পারে শতাধিক বছর। কচ্ছবের আয়ু তিনশ বছরের বেশী। তাই মানুষ চাইছে আয়ুকে যত বেশী সম্ভব বৃদ্ধি করতে। শরীরের যাবতীয় কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণের কাজ চলছে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরিতে। ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। মানুষ এক সময়ে আরো অনেক বেশী দীর্ঘায়ু লাভ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের শরীরটা অদ্ভুত ধরনের একটা স্বয়ংক্রিয় মেশিন। এত নিখুঁত যে বিজ্ঞানীরাও ভেবে অবাক হয়ে যান। মানুষের জ্ঞান জিন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে শরীরের নানা রহস্য। মানুষের শরীরটা প্রকৃতিরই দান। সেই প্রকৃতির নিয়ম কানুন আবিষ্কার করেই মানুষ প্রকৃতির প্রতিটি দানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেই বিপদ।

মানুষের ভোগ বিলাসের প্রয়োজনে প্রকৃতির পরিবেশকে মানুষই দূষিত করছে নানাভাবে। প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে নির্মমভাবে। তারই একটি রূপ হল শরীরের নানা রোগ। ডাক্তারকে খুঁজে বের করতে হয় কোথায় কিভাবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। ঔষধও প্রকৃতিরই দান। মানুষ প্রকৃতির দানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে প্রকৃতিকে শান্ত করে। এটাই রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা।

আমাদের হার্ট প্রতি মিনিটে ৭০/৭২ বার পাম্প করে রক্তকে ধমনীর মাধ্যমে সামনে ঠেলে দেয়। এই সময় রক্তের চাপ বেশী থাকে। হার্ট যখন প্রসারিত হয়ে শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে রক্ত টেনে নেয় তখন রক্তের চাপ থাকে কম।

এই দুই ধরনের রক্তচাপের প্রথমটিকে বলে সিস্টোলিক। এই সময় চাপ বেশী থাকে। দ্বিতীয়টিকে বলে ডায়াস্টোলিক। এই সময় রক্তের চাপ কম থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী চাপ থাকলে রক্তের শিরাগুলো নষ্ট হতে থাকে। এমনকি ফেটে গিয়ে বিপদ ঘটাতে পারে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে একটি রক্তচাপ মাপার যন্ত্র থাকা উচিত। পরিবারের কয়েকজন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে রক্তচাপ মাপার সঠিক কৌশলটা শিখে নিতে পারেন। আজকের যুগে এটা খুবই প্রয়োজন। শরীর খারাপ হলে প্রথমেই রক্তচাপ মেপে নিতে হবে। নাড়ি পরীক্ষার কৌশলটাও শিখে নেওয়া দরকার। আমাদের দেশে কবিরাজরা নাড়ি দেখেই রোগ ধরে নিতে পারতেন।

আধুনিক যুগের ডাক্তাররাও প্রথমেই রোগীর নাড়ি, চোখ এবং জিহ্বা পরীক্ষা করেন। পেটের অবস্থা বুঝে নেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ পরীক্ষা করেন।

শরীরের রক্তচাপ মাপার সাধারণ নিয়ম হল কনুই-এর উপর কাপড় পেঁচানো রাবারের ব্লাডার জড়িয়ে পাম্প করে বাতাস ঢুকানো হয়। ব্লাডারে বাতাসের চাপ যখন সিস্টোলিক প্রেসারের চেয়ে বেশী হয়ে যায় তখন রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হাতে তখন নাড়ি পাওয়া যায় না। এরপর ধীরে ধীরে যন্ত্রের বাতাস ছাড়তে থাকলে যেখানে আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়ে যায় মিটারের সেই স্থানটিই হল সিস্টোলিক চাপের মাপ। স্টেথোস্কোপ কানে দিয়ে যখন রক্ত চলাচলের শব্দ শোনা যাবে না মিটারের সেই স্থানটি হল ডায়াস্টোলিক প্রেসারের মাপ। রক্তচাপ মাপার মেশিন ঠিক আছে কিনা তা মাঝে মাঝে যাচাই করে নেওয়া দরকার। কারণ রক্তচাপের মাপ সঠিক না হলে ঔষধের মাত্রাও সঠিক হবে না। তাতে চিকিৎসা সঙ্কট সৃষ্টি হবে।

বাজারে রক্তচাপ মাপার জন্য ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবহার করা সহজ। কিন্তু কিছুদিন পরই ভুল রিডিং দিতে শুরু করে। তাতে মনে হয় যন্ত্রটি এখনো নিখুঁত হয়নি। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো আরো উন্নত ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্র বাজারে পাওয়া যাবে।

রক্তচাপ মাপার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে রোগী ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত কিনা। ক্লান্ত হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর রক্তচাপ মাপতে হবে। চেয়ারে বসা থাকলে কনুই সোজা করে টেবিলের উপর রাখতে হবে যাতে কনুই-এর উপরের অংশ হার্টের সমান্তরাল থাকে। শোয়া অবস্থায় রক্তচাপ মাপলেও এ দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগী বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের চেম্বারে অথবা হাসপাতালে রক্তচাপ মাপা দরকার। তাহলে সময়মত সঠিক চিকিৎসা শুরু করা যাবে। ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে গেলে পুরানো প্রেসক্রিপশান অবশ্যই সঙ্গে করে নিতে হবে।

রক্তচাপ যত বাড়ে বিপদের সম্ভাবনাও ততই বাড়ে। ধূমপান, মদ্যপান বা অন্য কোন ড্রগ ব্যবহার করলে রক্তচাপ দ্রুত বেড়ে যায়। রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হলে যেমন বিপদ, রক্তচাপ কম হলেও তেমনি বিপদ একথা সবসময় মনে রাখতে হবে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধির সঠিক কারণ বুঝা যায় না। অতি আধুনিক হাসপাতালে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও শতকরা একশ ভাগ কারণ আবিষ্কার করা এখনো সম্ভব হচ্ছে না।

গর্ভবতী মহিলাদের রক্তচাপ প্রসবের পরে সেরে যায়। গর্ভনিরোধক টেবলেট বা অন্য কোন ঔষধের কারণে রক্তচাপ বাড়লে তাও ঔষধ বন্ধ করার পর ধীরে ধীরে সেরে যায়। কিডনীর কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে কিডনীর চিকিৎসা করার পর রক্তচাপ সেরে যায়। অন্য কোন কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধির রোগ হলে তা সারানো যায় না। সারা জীবন ঔষধ খেতে হয়। বংশগত কারণে ব্লাডপ্রেসার হলে তাও সারানো যায় না। তবে যেকোন ধরনের রক্তচাপ বা ব্লাডপ্রেসার ঔষধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

দীর্ঘকাল ব্লাডপ্রেসারে ভোগলে শরীরের কিছু কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় এরূপ ক্ষতির অন্য কারণও থাকতে পারে। শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতি হলে রোগীর চিকিৎসা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়।

ব্লাডপ্রেসারের ফলে যেসব অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে সেগুলো হল (১)

কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া (২) ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে যাওয়া (৩) চোখের রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়া (৪) হার্টের বাঁদিক বড় হয়ে যাওয়া।

এসব ক্ষতি বাড়তে থাকলে কিডনী নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্রেনস্ট্রোক হতে পারে। চোখের ভেতর রক্তপাত হতে পারে। হার্ট ফেলিওর হতে পারে। তাই ব্লাডপ্রেসার দেখা দিলে খুবই সতর্কতা প্রয়োজন। রোগের বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা থাকলে যথাসময়ে সতর্ক হওয়া সম্ভব। হার্ট, চোখ, কিডনীতে যেকোন ধরনের অসুবিধা দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। চরম ক্ষতি হবার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিস্টোলিক প্রেসার বাড়তে থাকে। ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে পারলে প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে। ডায়াস্টোলিক প্রেসার সাধারণত খুব বেশী বাড়ে না। কারো কারো ডায়াস্টোলিক প্রেসার কমেও যেতে পারে সবই নির্ভর করে খাদ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর।

মেয়েদের ক্ষেত্রে হাই ব্লাডপ্রেসার কম দেখা যায়। কারণ মেয়েদের হরমোন ব্লাডপ্রেসারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের শরীরে এই রক্ষা কবজ হরমোহন সক্রিয় থাকে। মেনোপজ অর্থাৎ রজঃনিবৃত্তির পরই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। মেয়ে পুরুষ সমানভাবে ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হতে থাকে। ক্ষতির মাত্রাও একই রকম হয়।

ভারতে গ্রামীণ গরীব লোকদের মধ্যে ব্লাডপ্রেসার আক্রান্তের সংখ্যা কম। সম্ভবতঃ পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় বলেই এমনটা হয়।

শরীরের ওজন বেশী হলে ব্লাডপ্রেসারের আক্রমণ সহজেই হয়। মেদবহুল শরীরে শুধু ব্লাডপ্রেসার নয় ডায়াবেটিস এবং হার্টের অসুখও বেশী হয়।

মন খারাপ হলে বা দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ থাকলে হঠাৎ করে হাই ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ দেখা দেয়। মন শান্ত হলে শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু যাদের প্রেসার বা হার্টের সমস্যা আছে তারা হঠাৎ রেগে গেলে হার্ট স্ট্রোক হতে পারে। তাই প্রেসার বা হার্টের রোগীদের সর্বদা মানসিক সংযম রক্ষা করে চলতে হয়।

বেশী লবণ খেলে প্রেসার এবং হার্ট দুয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। তাই প্রয়োজনের বেশী লবণ খাওয়া উচিত নয়। লবণ বেশী খেলে যেমন ক্ষতি, কম

খেলেও তেমনি ক্ষতি। খাবার লবণে থাকে সোডিয়াম আর ফলের রসে থাকে পটাসিয়াম। এই দুটি লবণ শরীরে পরিমাণ মত না থাকলে হঠাৎ বিপদ হতে পারে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খেলে বদহজম হয়। চর্বি জাতীয় খাবার বেশী খেলে শরীরে বেশী পরিমাণে কোলেস্টেরল জমে বিপদ ঘটায় এটা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে খাওয়ার লোভ কমিয়ে সংযম থাকা উচিত। যেকোন বয়সেই খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে নিজেই সংযম রক্ষা করতে হবে।

আমাদের দেশে বহুকালের অভিজ্ঞতা থেকে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়েছে **উনা ভাতে দুনা বল, ভরা ভাতে রসাতল**। আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রবাদ বাক্যটিকে সত্য বলে মনে করে এবং সকলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য বলে গণ্য করে।

নিয়মিত মদ খেলে ব্লাডপ্রেসার বাড়বেই। মদ খেয়ে ব্যায়াম করলে শরীর ঠিক থাকবে এই ধারণা একেবারেই ভুল। যেকোন খাদ্য ও পানীয় পরিমাণ মত খেতে হবে। নতুবা দুর্ভোগের জন্য তৈরী থাকতে হবে।

বংশগত কারণে ব্লাডপ্রেসার হয়। কিন্তু পরিবারের সকলেরই একইরকম হবে তেমন নয়। প্রত্যেকের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে সংযমের পার্থক্যের জন্য পৃথক পৃথক ফল হয়। অনেকে বংশগত কারণ থাকা সত্ত্বেও রোগ মুক্ত থাকতে পারে।

জাতিগত বা গোষ্ঠীগত কারণেও ব্লাডপ্রেসারের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় কালো মানুষদের মধ্যে ব্লাডপ্রেসারের রোগী বেশী দেখা যায়।

ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে প্রকৃত সমীক্ষা হয়নি। তবে সাম্প্রতিককালে ভারতীয়দের মধ্যেও ব্লাডপ্রেসার রোগীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী এবং খাদ্যাভ্যাসজনিত কারণেই এটা ঘটছে মনে করা হয়।

ব্লাডপ্রেসারের কতকগুলো উপসর্গ আছে। এগুলোর যেকোন একটি বা একাধিক উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ব্লাডপ্রেসারের উপসর্গ

১) মাথা ঘোরা
২) বুক ধর ফর করা
৩) বুকে ব্যথা হওয়া
৪) পা ফোলা
৭) শরীরে অকারণে ঘাম হওয়া
৮) পরিশ্রমে দম অটকে যাওয়া
৯) মাংসপেশির দুর্বলতা
১০) বেশী প্রস্রাব হওয়া

৫) হঠাৎ চোখে ঝাপসা দেখা ১১) হাঁটতে মাংসপেশীতে ব্যথা হওয়া
৬) ঘুম না হওয়া ১২) হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া

ডাক্তার বংশগত বা পারিবারিক ইতিহাস জেনে নিয়ে ব্লাডপ্রেসার মেপে একটা সিদ্ধান্তে যেতে পারবেন। ডাক্তারের কাছে কোন কিছু গোপন করবেন না। ধূমপান করেন কিনা, মদ খান কিনা। চর্বিযুক্ত খাবার বেশী খান কিনা সময়মত খাওয়া ও বিশ্রামের অভ্যাস মেনে চলেন কিনা ইত্যাদি সঠিকভাবে ডাক্তারের কাছে বলবেন। তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

পেশাগত খবরাখবরও ব্লাডপ্রেসারের কারণ নির্ণয়ে বিশেষভাবে জরুরী। কাজের ধরন, পরিবেশের অবস্থা, ধুলা, বালি, ধোয়া, শব্দ, কোলাহল ইত্যাদির খবর জানা দরকার। নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস আছে কিনা তাও জানাতে হবে। কোন ঔষধ খাচ্ছেন কিনা, অন্য কোন রোগে ভুগছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ও ডাক্তারকে জানাতে হবে। সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্লাডপ্রেসারের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

কতকগুলো পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে। (১) ব্লাডসুগার খাওয়ার আগে ও পরে (২) সোডিয়াম-পটাসিয়াম (৩) ক্রিয়েটিনিন-কিডনীর অবস্থা বুঝার জন্য (৪) ই সি জি হার্টের অবস্থা বুঝার জন্য (৫) কোলেস্টেরল পরীক্ষা শরীরের মেদ সম্পর্কে জানার জন্য (৬) প্রস্রাব পরীক্ষা কোন সংক্রমণ আছে কিনা তা জানার জন্য।

বিশেষ প্রয়োজনে আরো কিছু পরীক্ষা করতে হয় যেমন - (১) ইউরিন কালচার (২) ইউরিক এসিড (৩) বুকের এক্সরে (৪) ইকো কার ডিওগ্রাম ইত্যাদি। এসব পরীক্ষা অকারণে নয়। সঠিক চিকিৎসার জন্যই প্রয়োজন।

কিছু লোক আছেন যাদের শরীরে ব্লাডপ্রেসার আছে কিন্তু শরীরে কোন উপসর্গ নেই। এমন রোগীরা বুঝতেই পারেন না যে তিনি ব্লাডপ্রেসারের রোগী। ফলে নিঃশব্দে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এরাই হঠাৎ করে স্ট্রোক করে মারা যান। অনেক সময় চিকিৎসারও সুযোগ পান না।

এই কারণে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি করা জরুরী প্রয়োজন। শিশু বা কিশোররাও ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হতে পারে। উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসা সহজ হয়। ১৬ বছর পর্যন্ত এক ধরনের চিকিৎসা। এরপরে সমস্যাটা পূর্ণ বয়স্কদের মতই হয়ে যায়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষত ষাট বছরের পর অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তি ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সুগার বা ডায়াবেটিসের সমস্যাও দেখা দেয়। এ-দুটি রোগ একসঙ্গে থাকলে তৃতীয় রোগ হার্টের সমস্যাও সৃষ্টি হয়ে যায়। সময়মত চিকিৎসা না হলে, চতুর্থ রোগ কিডনীর সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বিপদ একে একে বাড়তেই থাকে।

কোলেস্টেরল জমে ধমনী শক্ত হয়ে গেলে রক্তচাপ মাপতে গিয়ে অনেক সময় ভুল হয়। ভুল মাপের ফলে ভুল চিকিৎসা হবে। ফলে বিপদ আরো বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে সিস্টোলিক চাপটা বেশী থাকে। সেটা ভাল করে দেখতে হবে।

আসল কথা হল সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা শুরু করতে পারলে ব্লাডপ্রেসারে ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো যায়। এমনকি হার্টের রোগ আটকে দেওয়া যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা যায়।

সতর্কতার দায়িত্ব রোগীর নিজের এবং পরিবার পরিজনের। হঠাৎ একটু সুস্থবোধ করলে প্রেসারের ঔষধ বন্ধ করে দেবার অভ্যেস অনেকের আছে। এটা ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া প্রেসারের ঔষধ বন্ধও করা যায় না, পরিবর্তনও করা যায় না। একই পরিবারে দু'জন রোগীর ঔষধ দু'রকম হতেই পারে।

নিয়মিত ব্যায়াম করলে একটানা ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যেস করলে ব্লাডপ্রেসার নর্মূল থাকতে পারে। কিন্তু ঔষধ বন্ধ করা যায় না। — কারণ এ রোগ সারে না, সুযোগ পেলেই বিপদ ঘটায়, এ কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে।

ব্লাডপ্রেসারের বিপদ

ব্লাডপ্রেসার হঠাৎ করে বাড়তে পারে আবার হঠাৎ করে কমতেও পারে। দুটোই করে খুব বিপদ ডেকে আনে। তাই অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়।

বিভিন্ন কারণে প্রেসার বাড়তে পারে বা কমতেও পারে। এসব কারণগুলো জানা থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। যেমন

(১) হার্ট ফেলিওর হলে প্রেসার হঠাৎ কমে যেতে পারে।

(২) কোন কারণে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে প্রেসার কমে যায়।

(৩) সাপে কামড় দিলে বা বিষপান করলে প্রেসার কমে যায়।

(৪) মাথায় আঘাত পেলে প্রেসার কমে যায়।

(৫) শরীরে কোথাও ভীষণ রকম ইনফেকশন হলে প্রেসার কমে যায়।

(৬) কোন কারণে শরীরে জলীয় অংশ বেশী জমে গেলে প্রেসার কমে যায়।

(৭) আগুনে পুড়ে গেলেও শরীরের ব্লাডপ্রেসার কমে যায়।

(৮) অনেক দিন অসুস্থ হয়ে থাকলেও ব্লাডপ্রেসার কমে যায়।

(৯) স্নায়ুবিক দুর্বলতার কারণেও ব্লাডপ্রেসার কমে যায়।

(১০) অনশন ধর্মঘট করলেও ব্লাডপ্রেসার কমে যায়।

যেকোন কারণেই হোক ধমনীতে রক্তের সঞ্চালন কমে গেলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠে। যাদের হার্টে পেস মেকার বসানো থাকে তাদের পেস মেকার অকেজো হয়ে গেলেও হঠাৎ করে ব্লাডপ্রেসার কমে যায়। খুব দ্রুত হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে রোগী মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

রক্তের জীবাণু সংক্রমণ হলেও একই রকম বিপদ হতে পারে। রোগীর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বড় বিপদের সংকেত। এরূপ অবস্থায় হাসপাতাল ছাড়া জরুরী চিকিৎসার সুযোগ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এসবই লো প্রেসারের বড় বিপদের লক্ষণ।

হাই ব্লাডপ্রেসারের বিপদ সংকেতও প্রায় একইরকম। উভয় ক্ষেত্রেই জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সময়মত সঠিক চিকিৎসা হলে মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে আসা সম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা অনেক বেশী উন্নত। অবশ্য সব হাসপাতালে সবরকম আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ এখনো সৃষ্টি হয়নি। যেখানে আছে সেখানেই দ্রুত নিয়ে যেতে হবে।

সাবধান বাণী

ব্লাডপ্রেসার ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং সারা জীবন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। সাময়িক ভাল থাকলেও ঔষধ বন্ধ করা যাবে না। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যেকোন ঔষধ খাওয়া যাবে না। অনেক ঔষধ আছে যা কিডনী, লিভার, হার্ট ও চোখের ক্ষতি করতে পারে। ব্লাডপ্রেসারের সঙ্গে ডায়াবেটিস থাকলে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা বেশী। সময়মত সাবধান না হলে হার্টও খারাপ হতে পারে। -- ওজন ঠিক রাখতে হবে। খাদ্য সম্পর্কে সংযমী হতে হবে।

হার্টের সমস্যা

আধুনিক সমাজে ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার এবং হার্টের সমস্যা সারা বিশ্ব জুড়ে প্রধান সমস্যা রূপে গণ্য হচ্ছে। কারণ এসব রোগে মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়ছে এবং আক্রান্ত রাগীর সংখ্যাও অস্বাভাবিক হাড়ে বাড়ছে। তাই রাষ্ট্রসংঘ জনচেতনা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের প্রকল্প চালু করেছে। ভারত সরকারও জনচেতনা বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

সুগার, প্রেসার এবং হার্ট এই তিনটি রোগের প্রধান কারণগুলো মোটামুটি একই রকম। একটিতে আক্রান্ত হলে ক্রমে ক্রমে তিনটি রোগেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তিনটিতেই আক্রান্ত হলে কিডনী এবং চোখেরও বিপদ অনিবার্য হয়ে উঠে। সুখের কথা আধুনিক চিকিৎসায় রোগ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ অনেক বেড়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে জিন চিকিৎসা শুরু হয়ে গেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি বড় ধরনের বিপ্লব ঘটে যাবে। যেমন ঘটেছে শিল্পক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স আবিষ্কারের ফলে। বর্তমানে একটি হাসপাতালে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে যেকোন রোগের চিকিৎসায় পরামর্শ নেওয়া যায়। এর ফলে অনেক জটিল ও মারাত্মক রোগীর জীবন রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জিন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত যেকোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সারা বিশ্বে যেহেতু গবেষণা শুরু হয়েছে, সেহেতু জিন প্রযুক্তির আগমন আর বেশী দূরে নয়। অসুস্থ হার্টের পরিবর্তে নতুন জিন বসিয়ে দেহের অভ্যন্তরে নতুন হার্ট সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। লিভার এবং কিডনীর সমস্যাও এভাবে সমাধান করা হবে।

বংশগত কারণে হার্টের রোগ হতে পারে। কাজেই বাবা-মা অথবা রক্তের সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের হার্টের রোগ থাকলে ছেলেমেয়েদের হার্টের রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই বলে ভাই-বোন সকলেই একসঙ্গে আক্রান্ত হবে এমন নয়। তবে কোন উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

মেয়েদের শরীরে যতক্ষণ ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনের ক্ষরণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হার্টের রোগে কাবু হবার সম্ভাবনা কম। মাসিক রজঃনিবৃত্তি বন্ধ হবার পর মেয়েদেরও হার্টের রোগ পুরুষের মতই দেখা দিতে পারে।

যেসব কারণে হার্টের রোগ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেগুলো হল

(১) শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া
(২) ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া
(৩) ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হওয়া
(৪) রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া
(৫) এক জায়গায় বসে কাজ করা
(৬) বয়সের কারণে দুর্বল হওয়া
(৭) বংশগত কারণ
(৮) ধূমপানের ফলে সমস্যা
(৯) পরিশ্রম না করা
(১০) খাদ্যে সংযমের অভাব

হার্টের রোগ দেখা দেবার আগেই খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ওজন এবং মেদ কমাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সুস্থ জীবনযাত্রা প্রণালীর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, প্রতিদিন সময়মত ঘুমানো, সপ্তাহের ছুটির দিনে বাড়ীতে কিছু কাজকর্ম করা, বাগান করা, বাজার করা, সময় মত খাওয়া দাওয়া করা, নিয়মিত কিছু ব্যায়াম এবং খেলাধূলা করা, হাঁটা ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ধূমপান এবং মদ্যপানের অপকারিতা এবং ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সতর্কতা একান্তই দরকার।

আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে রক্তের মাধ্যমে পাওয়া অক্সিজেন। হার্টেরও তাই। হার্টের উপরে জালের মত ছড়িয়ে থাকা করোনারী আর্টারিগুলোর মাধ্যমে হার্টে রক্ত চলাচল করে। হার্টের প্রধান কাজ হল পাম্প করে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করা। করোনারি হার্টে চর্বি জমে গেলে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলে করোনারি হার্ট ডিজিজ বা ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ।

এই রোগের শুরুতে চলাফেরা করতে বা উঁচুনীচু জায়গায় উঠানামা করতে বা সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করতে হঠাৎ বুকের মাঝখানে পাথর চাপিয়ে দেবার মত ব্যথা হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে যায়। আবার কখনো ব্যথা বুক থেকে পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ কোন উপসর্গ প্রকাশ পায় না। ফলে তারা সাবধান হবার সুযোগ পায় না। হার্টের রোগ ক্রমাগত জটিল ও ভয়ঙ্কর হতে থাকে অথচ রোগী কিছুই টের পায় না।

৪০ বছর বয়সের পর প্রত্যেকে বছরে একবার সব কিছু পরীক্ষা করিয়ে নিলে সময়মত রোগ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসাও শুরু করা যায়। ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ মাঝে মাঝে কোন না কোন উপসর্গের মাধ্যমে জানান দেয়। কিন্তু অনেকেই তা গ্রাহ্য করেন না। কারণ হঠাৎ কোন উপসর্গ দেখা দিল আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম

নেবার পর ঠিক হয়ে গেল। এমন অবস্থায় রোগী সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বিপদটা জানা থাকলে সতর্ক হবেন এটাই জনচেতনা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের হার্ট এক ধরনের শক্ত পেশি দিয়ে তৈরী। দেখতে অনেকটা মোচার মত। বুকের মাঝখানে থাকে হার্ট, দু'দিকে থাকে দুটি ফুসফুস। হার্টের তিনটি স্তর আছে। উপরে একজোড়া পাতলা চাদরের মত আচ্ছাদন। ভিতরের দিকে হার্টের গায়ে লেগে থাকে সিরামে ভরা ঝিল্লি। মাঝখানে হার্টের পুরু স্তর বিশেষ ধরনের পেশি দিয়ে তৈরী। এই পেশির মধ্যেই থাকে শিরা, উপশিরা, ধমনী ও তার শাখাপ্রশাখা।

হার্ট ঠিক মাঝখানে একটা মোচা পর্দা দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত। দুটি ভাগই দুটি আলাদা পাম্পের মত কাজ করে। ডানদিকের পাম্প শরীরের সমস্ত দূষিত রক্ত গ্রহণ করে শোধন করার জন্য ফুসফুসে পাঠায়। বামদিকের পাম্প ফুসফুস থেকে শোধিত রক্ত গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। এটাই হার্টের প্রধান কাজ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম এই কাজ করে হার্ট।

হার্টের দুটি ভাগই আবার উপরে ও নীচে দুটি করে চেম্বারে বিভক্ত। উপরের দুটি কক্ষকে বলে এট্রিয়াম বা অলিন্দ। নীচের দুটি কক্ষ বা চেম্বারকে বলে ভেনট্রিকল বা নিলয়। উপরে ও নীচে একটি এট্রিয়াম এবং একটি ভেনট্রিকল নিয়ে একটি পাম্প। দুদিকে দুটি পাম্প আলাদা আলাদা কাজ করে। ডানদিকের এট্রিয়াম দুটি মহাশিরার মাধ্যমে কাল রংয়ের দূষিত রক্ত গ্রহণ করে। বামদিকের এট্রিয়াম চারটি ফুসফুস শিরার মাধ্যমে শোধিত লাল রক্ত গ্রহণ করে।

হার্টের চারটি কক্ষ এমনভাবে তৈরী যে একটি কক্ষের রক্ত অন্য কক্ষের রক্তের সঙ্গে মিশতে পারে না। এট্রিয়াম এবং ভেনট্রিকলের মাঝখানে এমনভাবে ভাল্ব বসানো আছে যে, রক্ত শুধু একদিকেই প্রবাহিত হতে পারে।

হার্ট যেমন শরীরের সমস্ত অংশে বিশুদ্ধ রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি যোগায়। তেমনি হার্টের জন্য অক্সিজেন এবং পুষ্টি যোগায় দুটি করোনারি আর্টারি।

হার্টের নিজস্ব ক্ষমতায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সমানভাবে হার্টে ছড়িয়ে পড়ে। ডান এট্রিয়ামের উপর দিকে ডিম্বাকৃতির পেশি ও নার্ভ কোষ আছে যাকে বলে সাইনো এট্রিয়াল নোড বা সংক্ষেপে এস এ নোড। এখান থেকেই বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

শরীরের সমস্ত ধমনী বারে বারে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষে রক্তজালকে পরিণত হয়। এই রক্ত জালকের পাতলা দেওয়াল ভেদ করে শরীরের সব কোষ রক্ত থেকে অক্সিজেন এবং পুষ্টি গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং দূষিত পদার্থ রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। দূষিত রক্ত শিরা, উপশিরার মধ্য দিয়ে ফুসফুস ধমনী দিয়ে ফুসফুসে চলে আসে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যায়। প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে যে বাতাস আসে তা থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুসফুস।

হার্টের ডানদিকের পাম্প শুধু ফুসফুসে রক্ত পাঠায়। কিন্তু বামদিকের পাম্প সারা শরীরে রক্ত পাঠায়। অর্থাৎ বামদিকের পাম্প বেশী কাজ করে। একবার সংকোচন এবং একবার সম্প্রসারণ নিয়ে একটি স্পন্দন সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষবার হার্টের স্পন্দন হয়। শরীরের অসংখ্য কোষে নিয়মিত অক্সিজেন ও পুষ্টি যোগাতে ৯৬ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হার্ট প্রতি মিনিটে চার থেকে ছয় লিটার রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে পাঠায়। পরিশ্রমের সময় বা খেলাধূলার সময় এই মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

কোন কারণে হার্টের কর্মক্ষমতা কমে গেলে তাকে বলা হয় হার্টের অসুখ। বিভিন্ন অসুখের উপসর্গ প্রায় একই রকম থাকে। তাই রোগীর পক্ষে হার্টের অসুখ বুঝে উঠা সম্ভব নয়। কোন উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তার দেখাতে হবে। হার্টের ব্যথা এবং অম্বলের ব্যথা প্রায় একরকম। ডাক্তারই পরীক্ষা করে সঠিক রোগটির চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন।

হার্টের অসুখে প্রধান তিনটি উপসর্গ হল- (১) বুক ধরফর করা (২) বুকে ব্যথা হওয়া (৩) শ্বাসকষ্ট হওয়া। তাছাড়া, মাথা ধরা বমির ভাব হওয়া, প্রস্রাব কম হওয়া, কাজে একাগ্রতার অভাব হওয়া, অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গও থাকতে পারে।

নাড়ির গতি বেশী বা কম হলে, স্পন্দন অনিয়মিত হলে রক্তচাপ বেড়ে গেলে, হার্ট আয়তনে বেড়ে গেলে অভিজ্ঞ ডাক্তার সহজেই হার্টের অসুখ সনাক্ত করতে পারেন। হার্টের অসুখ একবার হলে হার্টের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। অসুখ যখন ধরা পড়ে তখন আর হার্টকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এজন্যই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়েছে - **Prevention is better than cure** অর্থাৎ রোগ হবার আগেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। হার্টের রোগ সম্পর্কে জানা থাকলে সাবধান হওয়া যায়।

জন্মগত হার্টের অসুখ

অনেক শিশু হার্টের অসুখ নিয়ে জন্মায়। মায়ের পেটে শিশুর শরীর গঠনের প্রথম পর্বে এক মাসের মধ্যে হার্ট তৈরী হয়ে যায়। মায়ের পেটে কোনরকম জীবাণু সংক্রমণ বা অন্য কোন কারণে হার্টের গঠনে ত্রুটি সৃষ্টি হলে সেই শিশু হার্টের অসুখ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরও শিশু যদি কোন জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয় তাহলেও হার্টের অসুখ সৃষ্টি হতে পারে। দূষিত পরিবেশ, পুষ্টির অভাব এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবের জন্যও শিশুর হার্ট খারাপ হতে পারে।

বড়দের ক্ষেত্রে হাই ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস, দীর্ঘদিনের হাঁপানি, কাশি ইত্যাদি কারণেও হার্টের অসুখ হতে পারে। মারাত্মক ধরনের জীবাণুর আক্রমণে হার্টের অসুখও মারাত্মক হতে পারে। কারণ যক্ষ্মা, গণোরিয়া, সিফিলিস বা কোন ভাইরাসের আক্রমণেও হার্টের মারাত্মক অসুখ হতে পারে।

থাইরয়েড গ্রন্থির রোগের জন্যও হার্টের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। শরীরে বেশী চর্বি জমলেও হার্টের অসুখ হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন টিউমার বা ক্যান্সার হয় হার্টেও তেমনি টিউমার বা ক্যান্সার হতে পারে। বিভিন্ন কারণে হার্টের ভাল্ব নষ্ট হতে পারে। আসল কথা হল হার্টের রোগ বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ

রিউম্যাটিক ফিভার থেকে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ হয়। এই অসুখে হার্টের ভাল্ব নষ্ট হয়ে যায় বা ভাল্বের কর্মক্ষমতা কমে যায়। সাধারণত কিশোর বয়সেই এই রোগটি বেশী হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পুষ্টির অভাবই এই রোগের প্রধান কারণ। হার্টের তিনটি স্তরই এই রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রেনেও আক্রমণ হতে পারে।

এই রোগের শুরুতেই জ্বর হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বড় বড় গাঁটে যেমন হাঁটু, গোড়ালি, কব্জি ও কাঁধে ব্যথা হয়। একটার পর একটা গাঁটে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জ্বর চলতে থাকে, শরীরে ঘাম হয়্য নাড়ির গতি বেশী হয়। রোগীর দেহে গাঁটের কাছাকাছি ছোট ছোট মটর দানার মত গুটি হয়, তাছাড়া শরীরে ফিকে লাল রঙের দাগ হয়। সব রোগীর ক্ষেত্রে সব উপসর্গ দেখা নাও দিতে পারে। অনেকের শরীরে রিউম্যাটিক ফিভার ধরাও পড়ে না। গলায় বা পায়ে

ব্যথা হলে মলম লাগিয়ে দেওয়া হয়। জ্বর নেই বলে ডাক্তার দেখানো হল না।

রিউম্যাটিক ফিভার বার বার ঘুরেঘুরে আসে। কিন্তু উপসর্গ ধরা না পড়লে রোগও ধরা পড়ে না। অথচ প্রতিবারই হার্ট আক্রান্ত হয় এবং হার্টের সব অংশের ক্ষতি করে। এই ক্ষতি পরবর্তী সময়ে আর পূরণ করা যায় না। সারা জীবন হার্টের রোগী হয়ে থাকতে হয়। এই রোগের ভাল ঔষধ নেই। যথাসময়ে সতর্ক থাকা এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জ্বর, কাশি, ব্যথা হলেই ডাক্তার দেখানো উচিত।

ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ

শরীরের কোন অংশে রক্তাল্পতা দেখা দিলে তাকে ইস্কিমিয়া বলে। এটা রক্তহীনতা বা অ্যানিমিয়া নয়। রক্তে লোহিত কণিকা বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে যে অসুখ হয় তাকে বলে অ্যানিমিয়া।

হার্টের মায়োকার্ডিয়ামে (হার্টের মূল অংশ) রক্তের অভাব দেখা দিলে তাকে বলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ। করোনারী ধমনীতে চর্বি জমে গেলে রক্ত চলাচল কমে যায়। এই অবস্থাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস। বামদিকের মায়োকার্ডিয়াম আয়তনে বড় হয়ে যায়, ভেন্ট্রিকলও বড় হয়। এর ফলে প্রয়োজন মত রক্ত হার্টে আসে না। শরীরের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ করা হার্টের পক্ষে সম্ভব হয় না। এটাই ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের বড় সমস্যা।

মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনোপজের আগে এরূপ সমস্যা সাধারণত থাকে না। ৫০ বছর বয়স হয়ে গেলে মেয়েরাও এই রোগে আক্রান্ত হয়।

হাই ব্লাডপ্রেসার থাকলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যেকোন রকম ধূমপানের ফলেও তাড়াতাড়ি এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

থাইরয়েড হরমোনের অভাব ঘটলে এবং খাদ্যে বেশী পরিমাণে প্রাণিজ ফ্যাট থাকলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী হয়ে যায়। করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জমে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস সৃষ্টি হয় এবং রক্ত চলাচলে সঠিকভাবে হয় না। ফলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের আক্রমণ শুরু হয়।

অত্যধিক মানসিক চাপ, সবসময় বসে কাজ করা, খিটখিটে মেজাজ, অল্পতেই উত্তেজিত হওয়া এবং মদ্যপানের অভ্যাস ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রধান কারণ। তাছাড়াও বংশগত কারণ অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের কারণে বুকে যে ব্যথা হয় তাকে বলে অ্যানজাইনা পেকটারস। হার্টের মূল অংশে যখন রক্তের অভাব দেখা দেয় তখনই এই ব্যথা শুরু হয়।

রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকলে অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমে যায় এর ফলেও বুকে ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় বুকে বা পেটের উপরদিকে চাপ চাপ ব্যথা থাকে। এই ব্যথা গলায় ঘাড়ে ও পিঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, সঙ্গে বুকে ধরফর করা বা শ্বাসকষ্টও থাকতে পারে। কিছুক্ষণ বিশ্রামে থাকলে সাময়িক উপশম হয়। ব্যথা কমানোর জন্য ঔষধও ব্যবহার করা হয়। জিবের তলায় রাখলে ব্যথা কমে যায়।

যাদের এই রোগ ধরা পড়েছে তাদের পক্ষে খাওয়ার পর হাঁটা উচিত নয়। ভারী কোন কাজ করা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়ানো উচিত নয়।

অ্যানজাইল হল কোন কারণে হার্টের পেশিতে অক্সিজেনের ঘাটতিজনিত ব্যথা। কখনো বেশী কখনো কম ব্যথা হলে তাকে বলে স্টেবল অ্যানজাইনা। কিন্তু ব্যথা হঠাৎ করে বেশী হলে এবং বাড়তে থাকলে তাকে বলে আনস্টেবল অ্যানজাইনা। এটা খুব বিপজ্জনক। এরূপ হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাতে হবে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

স্টেবল অ্যানজাইনা কম বিপজ্জনক। ডাক্তারের উপদেশ মেনে খাদ্য এবং ঔষধ গ্রহণ করলে বিপদ এড়ানো যায়।

করোনারি আর্টারি ডিজিজ

আমাদের শরীরে যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে হার্টের কাজই সবচেয়ে বেশী। হার্টের প্রধান কাজ হল শরীরের সর্বত্র রক্ত পৌছে দেওয়া। মায়ের পেটে হার্ট তৈরী হবার সময় থেকে এই কাজ শুরু হয় মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। হার্টের এই কাজে বিরতি মানেই মৃত্যু। হার্টের কাজ সঠিকভাবে চলার জন্য শক্তি দরকার হয়। রক্তের অক্সিজেন এবং পুষ্টি থেকেই হার্ট নিজের শক্তি অর্জন করে।

হার্টের কাজ সঠিকভাবে চলার জন্য অবিরাম রক্ত পেতে হবে। হার্টের করোনারি আর্টারির মাধ্যমে অবিরাম ধারায় রক্ত আসে হার্টে।

হার্টের প্রধান করোনারি আর্টারি দুটি। একটি ডানদিকে আরেকটি বামদিকে। অজস্র শাখা প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

হার্টের পেশিতে সবসময় সমান পরিমাণ রক্তের দরকার হয় না। কাজের উপর

নির্ভর করে রক্ত সরবরাহের পরিমাণ। বিশ্রামের সময় রক্ত কম লাগে। যেকোন কাজের সময় রক্ত বেশী লাগে। পরিশ্রমের ধরন অনুযায়ী চাহিদা বাড়ে কমে।

হার্টের কাজের ধরন অনুযায়ী যে পরিমাণ রক্ত দরকার তা না পেলেই হার্টের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। বেশী পরিশ্রমের সময় রক্ত কম পেলে হার্টের ভীষণ সংকট দেখা দেয়।

করোনারি ধমনির অক্ষমতার কারণেই হার্টের এই সংকট সৃষ্টি হয়। করোনারি ধমনির অসুস্থতার জন্য হার্টের যে অসুখ সৃষ্টি হয় তাকেই বলে করোনারি আর্টারি ডিজিজ।

করোনারি আর্টারি হল একটি নল বা ফাঁকা পাইপের মত। ফাঁকটা যতক্ষণ পরিষ্কার থাকে ততক্ষণ রক্ত চলাচলের কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু ফাঁকা পথটির কোন অংশ যদি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় তবে রক্ত চলাচল করতে পারে না। রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত স্নেহজাতীয় পলি জমে ফাঁকটা বন্ধ হতে থাকে। কতটা পলি জমেছে তার উপর নির্ভর করে রোগের অবস্থা।

অনেক রোগীকে বলা হয় ৬০% পলি জমেছে, কারো বা ৭০% পলি জমেছে, কারো ক্ষেত্রে ৮০% বা ৯০% পলি জমেছে। সময়মত চিকিৎসা না হলে ১০০% পলি জমে রোগী শেষ অবস্থায় পৌঁছে যায়।

অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মত হল করোনারি আর্টারিতে ৭০% পর্যন্ত পলি জমলে হার্টের সংকট শুরু হয়ে যায়। শরীরের প্রয়োজনও মিটে না হার্টের নিজের শক্তি ও পুষ্টিও কমতে থাকে। পলি জমে উঠার এই প্রক্রিয়াটির নাম হল অ্যাথেরোসক্লোরোসিস।

মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব আর্টারি অর্থাৎ ধমনি শক্ত এবং পুরু হতে থাকে। এর জন্য শরীরের অন্যান্য অংশে তেমন বিপদ হয় না। কিন্তু হার্টের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়। ধমনি পুরু হয়ে রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি হয়।

শরীরের রক্তে নানা পদার্থ তরল অবস্থায় মিশে থাকে। অনেক পদার্থ রক্তে গলে না। এসব পদার্থের মধ্যে কোলেস্টেরল হল এমন একটি পদার্থ যা রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এবং ধমনি ও শিরা উপশিরায় পলির মত জমতে থাকে। এগুলি আবার দু'রকমের হয়। একটি ভাল অপরটি খারাপ। অর্থাৎ একটি শরীরের মিত্র অন্যটি হল শরীরের শত্রু। খারাপ বস্তুটির প্রাধান্য হলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

করোনারি আর্টারির অ্যাথেরোসক্লোরোসিস সহজে হয় না। খুব বেশী হাইপ্রেসার থাকলে করোনারি আর্টারির আস্তরণে ক্ষত সৃষ্টি হয়। রক্তের এক ধরনের কণিকা এই ক্ষতে জমতে জমতে পলি সৃষ্টি হয়। ক্রমে ধমনির পেশি শক্ত হয়ে যায়। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা যত বাড়ে এই প্রক্রিয়া ততই বাড়তে থাকে। তামাকের ধোঁয়াতেও ধমনির গায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয় ফলে ধূমপানেও ধমনির পেশিতে পলি জমে ধমনির দেওয়াল শক্ত করে তোলে।

ডায়াবেটিস হলেও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গিয়ে ধমনির গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। শরীরে মেদ বেশী থাকলে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যায়। মানসিক চাপেও ধমনির ক্ষতি হয়।

সাধারণত ৫০ থেকে ৭০ বছরের বয়স্ক ব্যক্তিরাই করোনারি আর্টারি রোগে বেশী আক্রান্ত হন। পৃথিবীর সব দেশেই করোনারী আর্টারি রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। অন্য কোন রোগে পৃথিবীতে মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী নয়।

পঁচিশ বছর আগেও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোকের মৃত্যু হতো সংক্রামক রোগে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী লোকের মৃত্যু হয় করোনারি আর্টারি রোগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছে আগামী দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশে করোনারি আর্টারি রোগ মহামারির আকার ধারণ করবে। জীবনধারা এবং খাদ্য রুচির পরিবর্তনই এর মূল কারণ।

হার্টের বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে করোনারি আর্টারি রোগে মৃত্যুর হার প্রায় ৮০ শতাংশ। এই রোগে আকস্মিক মৃত্যুর হার বেশী হওয়ায় জনচেতনাও বাড়ছে।

হার্টের পেশিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে বুকে যে ব্যথা হয় তাকে বলে অ্যানজাইনা। এটা হল হার্টের রোগীর পক্ষে সাবধান বাণী। এই ব্যথা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকলে জিভের তলায় ঔষধ দেবার পরও যদি ব্যথা না কমে এবং শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে, ঘাম হয় এবং হাত, পা, কপাল ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে হার্টের উপর ভয়ানক আক্রমণ হয়েছে। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা বা সম্ভব হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। চরম মুহূর্তে অল্প ভুলও মারাত্মক পরিণতির কারণ।

করোনারি আর্টারি রোগের প্রধান কারণ খারাপ কোলেস্টেরল। চর্বি জাতীয় খাদ্য থেকে বেশী পরিমাণে কোলেস্টেরল তৈরী হয়। লিভারও কোলেস্টেরল

তৈরী করে। এটি শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ। কিন্তু শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই মহাবিপদ ডেকে আনে।

শুধু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেই কোলেস্টেলের সমস্যা অনেকটা সমাধান করা যায়। সুস্বাদু খাবারের লোভকে সংযত রাখতে হবে। প্রাণিজ চর্বির চেয়ে উদ্ভিজ চর্বি অনেক বেশী নিরাপদ। কোন কোন মাছের তেল বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের তেলে হার্টের পক্ষে উপকারী ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ পরিমাণ মত থাকে। এসব মাছ খাওয়া ভাল তবে কোনটাই পরিমাণে বেশী নয়।

এই রোগ প্রতিরোধে যা করণীয়

১) ধূমপান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
২) মোটা শরীর হলে মেদ কমাতে হবে।
৩) ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে হবে।
৪) হাই ব্লাডপ্রেসার থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৫) মন থেকে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ দূর করতে হবে।
৬) শারীরিক পরিশ্রম বা নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়াম করতে হবে।
৭) মাঝে মাঝে রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে।
৮) সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
৯) মানসিক চাপ কমাবার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে।
১০) মদ্যপানের অভ্যাস অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে চলতে পারে।
১১) বছরে একবার শরীরের সব রকম পরীক্ষা করাতে হবে।
১২) বংশগত কারণ থাকলে একেবারে শুরুতেই সতর্ক হতে হবে।

জীবাণু সংক্রমণে হার্টের রোগ

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ হয় গলায় বা শ্বাসনালীর উপর দিকে এক ধরনের জীবাণুর আক্রমণে। হার্টের ভিতরেও জীবাণুর আক্রমণ ঘটতে পারে।

হার্টের তিনটি স্তর (১) ভিতরের স্তরকে বলে এণ্ডোকার্ডিয়াম (২) মাঝের স্তরকে বলে মায়োকার্ডিয়াম (৩) বাইরের স্তরকে বলে পেরিকার্ডিয়াম। এই তিনটি স্তরেই ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া এবং ফাঙ্গাস ইত্যাদির আক্রমণ ঘটে।

দাঁত তোলার সময় বা দাঁতে স্কেলিং করার সময় রক্তের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত

হার্টের ভাল্বে এক প্রকার জীবাণু জমা হয়। স্ট্রেপটোককাস নামের এই জীবাণু শরীরের লোমকূপেও বসতি গড়ে তোলে। বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে বেডসোর জাতীয় ক্ষত থাকলে সেখানেও এই জীবাণু বাসা বাঁধে। এই রোগ হলে শরীরে সবসময় অল্পমাত্রার জ্বর থাকে। রক্ত কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়। খুব ঘাম হয়। প্লীহা এবং লিভার বড় হয়ে যায়। হার্টে গণ্ডগোল শুরু হয়। হার্টের এণ্ডোকার্ডিয়ামে এই রোগ হয়।

হার্টের ভাল্ব নষ্ট হয়, হার্ট ফেলিওর এর সম্ভাবনা বাড়ে, কিডনীও খারাপ হয়।

এই রোগের চিকিৎসা হাসপাতালেই করাতে হবে। কারণ ঘনঘন রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণ জরুরী।

মাইয়োকার্ডিয়ামে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণ হয়। অন্য কিছু জীবাণুরও আক্রমণ হতে পারে। ডিফথিরিয়া থেকেও আক্রমণ হতে পারে।

এই রোগে জ্বর হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, শরীর দুর্বল হয়, পা ফোলে, পায়ে জল জমে, বুকে ব্যথা হয় এবং ধরফর করে। হার্ট ফেলিওর হতে পারে।

পেরিকার্ডিয়ামে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ছাড়াও যক্ষ্মা জীবাণুর আক্রমণ ঘটতে পারে। হার্টে জল জমে রক্ত প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত জমে যেতে পারে।

এই রোগে শ্বাসকষ্ট হয়, নাড়ির গতি বেড়ে যায়, ফুসফুসে জল জমে, ঘাড়ে ও গলায় ধমনীতে রক্তের পরিমাণ বেশী হয়। এই রোগ হলে অনেক সময় অপারেশন করতে হয়। ডাক্তারের উপরই চিকিৎসার ভার দিতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক

করোনারি আর্টারিতে রক্ত প্রবাহ কমে গিয়ে হার্টের পেশির কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে হার্টের কর্মক্ষমতা কমে যায় এটাকে বলে হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তারী ভাষায় বলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন।

করোনারি আর্টারিতে ৭০ শতাংশ যখন পলি জমে যায় তখনই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় আর্টারিতে রক্ত জমাট বেঁধে যদি রক্ত চলাচল কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় তখনি হার্ট অ্যাটাক হয়।

আর্টারিতে রক্ত জমাট বেঁধে যে ডেলা তৈরী হয় তাকে বলে থ্রম্বাস। তাই এরূপ হার্ট অ্যাটাক হলে তাকে বলে থ্রম্বোসিস।

দীর্ঘকালীন ডায়াবেটিসে ভোগলে বা বড় রকমের কোন অপারেশন হলে এবং বৃদ্ধ বয়সে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হতে পারে। এটাকে বলে সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক।

হার্ট অ্যাটাক যেকোন সময়ে, যেকোন জায়গায় এবং যেকোন অবস্থায় হতে পারে। ঘুমের মধ্যে, কাজের সময়, হাঁটা, ব্যায়াম ও খেলাধূলার সময় বা কোন উত্তেজনার মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের আগে বুকে ব্যথা হয় বা দুর্বলতা দেখা দেয়। অনেকে তা বুঝতে পারেন না।

হার্ট অ্যাটাক হঠাৎ হলেও তার প্রস্তুতি শুরু হয় দীর্ঘকাল ধরে। কোনরকম উপসর্গ ছাড়াই হার্টের করোনারি আর্টারিতে পলি জমতে থাকে অনেকে তা বুঝতে পারেন না। কারণ হয়তো বিশেষ সক্রিয়তার কারণে হার্টের পেশিতে ভিন্নপথে রক্ত প্রবাহ চলতে থাকে।

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান লক্ষণ বুকে তীব্র ব্যথা। বুকের বামদিকে, বা ডানদিকের কাঁধে, ঘাড়ে, পিঠে, হাতে চোয়ালে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে বুক ধরফর করা, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি বমি ভাব, ঘাম, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাড়ির গতি কারোর কমে যায় আবার কারো বেড়ে যায়, ব্লাডপ্রেসার কমে যায়। সবগুলো লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে। কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিয়েও চলে যায়। যাদের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না তাদের ক্ষেত্রে সাইলেন্ট ডেথ অর্থাৎ নীরব মৃত্যুর আশঙ্কাই বেশী থাকে।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গের সঙ্গে অন্য অনেক রোগের উপসর্গের মিল আছে। তাই অনেকেই প্রথম দিকে সতর্ক না হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। ব্যথার ঔষধ, অ্যাসিডের ঔষধ, বমির ঔষধ খেতে দেওয়া হয়। ফলে হার্ট অ্যাটাকের রোগীর চিকিৎসার অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে ডাক্তারের আর কিছুই করার থাকে না।

বর্তমানে অনেক উন্নতমানের ঔষধ পাওয়া যায়। সময়মত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া গেলে বহু মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষা করা যায়।

হার্ট অ্যাটাকের আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। যারা সতর্ক হয় তারা দীর্ঘকাল হার্ট অ্যাটাক আটকে দিতে পারে। অর্থাৎ হার্টের যেকোন উপসর্গ দেখা দিলেই ডাক্তার দেখাতে হবে।

হার্টের আর্টারিতে রক্ত জমাট বেঁধে হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দিয়ে রোগীর জীবন রক্ষা করা যায়। বেশী দেরী হয়ে গেলে চিকিৎসার এই সুযোগ থাকে না।

বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা হলে লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যথা কোথা থেকে কোন দিকে যায়, কতদিন পর পর ব্যথা হয় এবং কতক্ষণ থাকে। এই তথ্য সঠিকভাবে দিতে পারলে চিকিৎসা সহজ ও সঠিক পথে চলতে পারে।

বড় বড় শহরে আজকাল জরুরী চিকিৎসার জন্য করোনারি কেয়ার ভ্যান থাকে। খবর পাওয়া মাত্র ডাক্তার ও নার্স প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ইনজেকশন সহ রোগীর বাড়ীতে পৌঁছে যায়। প্রাথমিক জরুরী চিকিৎসা শুরু করে দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে প্রয়োজন হলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। এরূপ ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নগণ্য সংখ্যক হাসপাতালেই আছে। প্রতিটি বড় হাসপাতালে এরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

করোনারি আর্টারি ডিজিজের হার্ট অ্যাটাকে উন্নত দেশগুলিতেও শতকরা পঞ্চাশজন রোগী হাসপাতালে পৌঁছার আগেই শেষ হয়ে যান। হার্ট অ্যাটাক যেখানে যে অবস্থায় হয় সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারলে অনেকেরই জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

হার্ট অ্যাটাকের ১৫ মিনিটের মধ্যে অনেকে মারা যান। তারা চিকিৎসার কোন সুযোগই পান না। অনেকে হার্ট অ্যাটাকের পর দুই ঘন্টা সময় পান চিকিৎসা শুরু করার। এই মূল্যবান সময় নষ্ট করা হলে জীবন রক্ষা করার সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে অ্যাটাকের পর ২৪ ঘন্টা সময় পান তাদের চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় যদি কাছাকাছি হাসপাতাল থাকে।

একবার হার্ট অ্যাটাকের পরও যারা সতর্ক থাকেন না বা জীবন ধারা বদলাতে পারেন না তারা অল্প দিন পরই দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকে ভোগতে পারেন। এরপরেও সতর্ক না হলে তৃতীয় বার হার্ট অ্যাটাকে মূল্যবান জীবনটা হারাতে পারেন।

হার্ট অ্যাটাকে হার্টের কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় হার্টের অনেক ক্ষতি সারিয়ে তোলা যায়। হার্ট নিজেই নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশ সারিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নষ্ট অংশের চারপাশে নতুন টিসু গজাতে শুরু করে। রক্তপ্রবাহের নতুন পথ সৃষ্টি হয়।

হার্টের রোগীদের শারীরিক এবং মানসিক বিশ্রাম দরকার। বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাকের পর রোগীর চারদিকে দল বেঁধে ভিড় করা উচিত নয়।

হার্ট অ্যাটাকর পর জীবন রক্ষা হলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অনেকে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক সহ্য করতে পারেন না। তাই সতর্ক থাকতেই হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবন ধারায় সংশোধন যেমন দরকার তেমনি খাদ্য নির্বাচন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, হাঁটা অভ্যাস করাও জরুরী প্রয়োজন। পরিশ্রম বলতে শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন তার বেশী নয়। ব্যায়াম হবে হাল্কা ধরনের খালি হাতের ব্যায়াম। হাঁটা প্রতিদিন ৩০ মিনিট।

হাঁটার ব্যাপারে নানারকম অভিজ্ঞতা আছে। অনেকের ধারণা খুব ভোরে হাঁটা ভাল। কিন্তু দেখা গেছে সকালের দিকেই হার্ট অ্যাটাক বেশী হয়। সকালে হাঁটার পর বাড়ী ফিরে এসে ক্লান্ত হার্টের রোগী হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বাড়ীর উঠানে বা ছাদে নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে হাঁটাই ভাল। বিশেষ করে বয়স্কদের বেলায়। একেবারে খালি পেটে হাঁটার চেয়ে কিছু খেয়ে হাঁটা ভাল। হার্টের রোগীদের খাওয়ার পর হাঁটা উচিত নয়। ইংরেজরা বলেন, রাতে খাবার পর আধঘন্টা হাঁটা ভাল আমাদের দেশে এ নিয়ম খাটে না। ওদের দেশে ঠাণ্ডা আমাদের দেশে গরম। কাজেই প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা ঠিক্ নয়। রাতে খাওয়ার আগে কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে। বুকে ব্যথা যাকে অ্যানজাইনা বলে তার প্রকৃত ঔষধ হল ব্যায়াম। কারণ ব্যায়াম করলে হার্ট বেশী রক্ত পায়। বেশী রক্ত মানে বেশী অক্সিজেন এবং বেশী পুষ্টি। কিন্তু তাই বলে বেশী ব্যায়াম করা উচিত হবে না।

বাইরে হাঁটতে গেলে একজন সঙ্গী থাকা উচিত। শরীরে অবস্থা অনুযায়ী বিশ্রাম নিতে হবে। নিয়মিত ঔষধ খেতে হবে। কোনরকম বিতর্কে যোগ দেওয়া উচিত নয়। যে কোন কারণে অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ সম্পর্কে সর্বদা খুব সাবধান থাকতে হবে। হতাশা এবং অবসাদ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর কিছু বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে যেমন -

(১) হার্ট অ্যাটাকের ফলে হার্টের বেশ কিছু শিরা উপশিরা নষ্ট হয়ে যায়। ধূমপান করলে বাকি শিরা উপশিরা দ্রুত নষ্ট হতে থাকবে। তাই ধূমপান বন্ধ করতে হবে। তামাক জাতীয় যেকোন দ্রব্য যেমন জর্দা, দোক্তা, পান মশলা বর্জন করতে হবে। তামাকের নিকোটিন শিরা উপশিরা সংকুচিত করে দেয়।

(২) অতিভোজন হার্টের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাবার অল্প পরিমাণে খেতে হবে। খাওয়ার পরেও যেন হার্টে ক্ষিদে থাকে। প্রয়োজনে তিনবার বা চারবার খান। একসঙ্গে বেশী নয়।

(৩) চা-কফি ও অন্যান্য পানীয় খুব কম খেতে হবে।

(৪) অনেকে বলেন মদ হার্টের পক্ষে ভাল। এই ধারণা ঠিক নয়। খুব মাত্রায় খেলে ক্ষতি কম হয়।

(৫) হার্টের রোগীর ভাল ঘুম হওয়া দরকার। ঘুমের ঔষধ খেয়ে নেশা বাড়ানো উচিত নয়। অল্প পরিমাণে ঘুমের ঔষধ খেয়ে শান্ত মনে চেষ্টা করলে ভালই ঘুম হয়। অনেকে বই হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেই ঘুম এসে যায়।

(৬) যেকোন রকম উত্তেজনা ও উদ্বেগ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

(৭) খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম হাওয়ায় বাইরে যাওয়া উচিত নয়। গরমের দিনে সকালে বা সন্ধ্যায় এবং শীতকালে দুপুর বেলায় বাইরে যাওয়া উচিত।

(৮) যেকোন সময় বুকে ব্যথা অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বা বসে বিশ্রাম নিতে হবে। বাইরে যাবার সময় সরবিট্রেট ঔষধ সঙ্গে রাখতে হবে। বেশী ব্যথা হলে জিভের নীচে একটি টেবলেট রেখে বিশ্রাম নিতে হবে। বেশী ব্যথা হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

(৯) হাই ব্লাডপ্রেসার সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্ত যাবার সময় ধমনীর গায়ে যে চাপ পড়ে তাকে বলে রক্তচাপ বা ব্লাডপ্রেসার।

(১০) ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট অ্যাটাক বেশী হয়। ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

(১১) শরীরের ওজন ঠিক মাত্রায় রাখতে হবে। শরীরে মেদ থাকলে তাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। হঠাৎ করে মেদ কমানোর চেষ্টা না করে ধীরে ধীরে মদ কমাতে হবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যায়াম করে।

পলিমনারি হার্ট ডিজিজ

ফুসফুস অসুস্থ হলে দীর্ঘকাল চিকিৎসা না করা হলে ফুসফুসের গঠনে এবং কার্যকলাপে পরিবর্তন ঘটে। ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং জালকগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বিতাড়নের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রক্তে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায়। এর থেকে শুরু হয় হার্টের অসুখ। এটাকে বলে পালিমনারি হার্ট ডিজিজ। বয়স্কদের ক্ষেত্রেই এ রোগ বেশী দেখা যায়।

হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, কাশি, শিরদাঁড়ার বিকৃতি, বুকের পেশীর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি ফুসফুসের রোগ এবং ফুসফুস ধমনী ও উপধমনীর মধ্যে রক্ত চাপের সমস্যা ইত্যাদি কারণ থেকে হার্টের এই অসুখটি সৃষ্টি হয়।

এই রোগের প্রতিরোধের জন্য ফুসফুসকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হয়। যেমন—

(১) গলার বা টনসিলের অসুখ হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(২) ঘনঘন সর্দি, কাশি, হাঁচি দেখা দিলে সুচিকিৎসা করা।

(৩) হাঁপানী, ব্রংকাইটিস বা ফুসফুসের কোন অসুখ হলে শুরুতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(৪) বুকের পাজরায় বিকৃতি থাকলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সাহায্য বা সারানোর ব্যবস্থা করা।

(৫) ধুলা, বালি, ধোঁয়া, সিমেন্ট, কয়লার গুঁড়া ইত্যাদি যে কাজে বেশী সে কাজ ছেড়ে দেওয়া।

(৬) বুকের পেশিতে গোলমাল থাকলে তার চিকিৎসা করা।

(৭) শরীরে মেদ বেশী থাকলে বা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

ফুসফুসের প্রধান রোগ হল হাঁপানি। এই রোগে দীর্ঘকাল ভোগলে হার্টের অসুখ হবেই। শ্বাসনালীর দেওয়াল ভারী হয়ে গেলে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারলেও বেরিয়ে অসতে বাধা পায়। ফুসফুসে বেশী বাতাস জমে চাপ সৃষ্টি করলে পাতলা পর্দাগুলো ছিড়ে যায় এবং রক্ত জালিকা নষ্ট হয়। এভাবে

ক্রমশ ফুসফুস এবং হার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলে হার্টের আকৃতি এবং আয়তনে পরিবর্তন ঘটে যায়। হার্ট ফেলিওর এর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

হাঁপানি রোগ সহজে সারে না। তবে শুরুতেই চিকিৎসা করাতে পারলে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। হাঁপানির নানারকম ঔষধ আছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তারই সঠিক ঔষধ নির্বাচন করবেন। হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে থাকলে হার্টের অসুখও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হাঁপানি রোগীর পক্ষে ধূমপান অবশ্যই বর্জন করা উচিত। কারণ তামাকের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট বাড়ে, ব্রংকাইটিস হয়, ফুসফুসের ক্যান্সার হয়। পেপটিক আলসারও হয়।

হার্ট ফেলিওর

হার্ট যখন কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে তখনই হার্ট ফেলিওর হয়। সাধারণভাবে বলা হয় হার্টফেল।

হার্টের দুটি ভাগে দুটি পাম্প রয়েছে। দুটি পাম্পই একসঙ্গে ফেল নাও করতে পারে। বামদিকের পাম্প ফেল করলে ফুসফুসে রক্ত যাবার ধমনীতে রক্ত জমে। ডানদিকে পাম্প ফেল করলে শরীরের শিরাগুলিতে রক্ত জমে উঠে। লিভার বড় হয়ে যায়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, পা ফোলে উঠে।

হার্টের বিভিন্ন রোগে এবং জন্মগত ত্রুটির কারণে হার্ট ফেল হয়। তবে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট অ্যাটাক, হার্টের ভাল্বের অসুখ, হাই ব্লাডপ্রেসার, হার্টের পেশির অসুখ ইত্যাদি কারণে হার্ট ফেল হয়।

হার্ট ফেলের অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত প্রবাহের পথ আটকে যাওয়া, কোন জায়গায় ইনফেকশন হওয়া, থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত গ্রন্থিরস ক্ষরণ, হার্টের স্পন্দনে ছন্দপতন, রক্তাল্পতা, মানসিক চাপ ইত্যাদি।

বিভিন্ন অসুখের প্রকৃতি ও প্রকোপ অনুযায়ী হার্ট ফেলের মাত্রা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ভাল্বের অসুখে বা মায়োকার্ডিয়াম রোগে ক্রণিক হার্ট ফেল হয়। বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হলে হার্টের ভাল্ব ফেটেগিয়ে অ্যাকিউট হার্ট ফেল হয়।

হার্ট ফেল হলে রক্ত প্রবাহের ব্যবস্থাটা বদলে যায়। মস্তিষ্কে এবং মায়াকোর্ডিয়ামে রক্ত সরবরাহ ঠিক থাকলেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্তপ্রবাহ কমে যায়।

হার্ট ফেল হলে শ্বাসকষ্ট, নিঃশ্বাস নেবার সময় রোগী উঠে বসে যায়,

কথাবার্তায় গোলমাল দেখা দেয়, ঘুম হয় না, শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায়। বমি বমি ভাব থাকে, কাশি হয়।

প্রচুর বিশ্রাম, সহজপাচ্য খাবার এবং নিয়মিত ঔষধ ও ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে পারলে রোগী ধীরে ধীরে সেরে উঠতে পারে।

হার্টের পরীক্ষা

হার্টের বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয় বিভিন্ন ধরনের। চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের। অন্যসব রোগের পরীক্ষার মত হার্টের ক্ষেত্রেও রক্ত পরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ, ভাল-মন্দ দু'রকমই দেখতে হয়। ব্লাড সুগার, প্রেসার, ই. সি. জি. রেকর্ড ইত্যাদি থেকে ধারণা করা যায় শরীরে ডায়াবেটিস প্রেসার এবং হার্টের অবস্থা কেমন আছে। এই তিনটি রোগের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ, ফুসফুসের অবস্থাও পরীক্ষা করতে হয়। নাড়ির গতি দেখতে হয়।

তারপর জেনে নিতে হবে রোগীর ইতিহাস এবং বংশের খবরাখবর। কারণ বংশগত রোগ হলে চিকিৎসার ধরন বুঝতে সুবিধে হয়। বুকের ব্যথার ধরন দেখে বোঝা যায় রোগটা কি ধরনের। ই. সি. জি. এ বিষয়ে কিছু আভাস দেয়।

আরো ভালোভাবে জানার জন্য বুকে একটি মেশিন বসিয়ে ২৪ ঘন্টা শরীরের রক্ত চলাচলের রেকর্ড গ্রহণ করা হয়। এটাকে বলে **হলটার পরীক্ষা**। এতে ২৪ ঘন্টায় হার্টের কাজের ধারা কেমন ছিল তা রেকর্ড করা হয়।

এরপরের ধাপে **ইকো কার্ডিওগ্রাম** করে হার্টের ছবি সরাসরি দেখা হয়। হার্টের বিভিন্ন কক্ষের এবং ভাল্বের কার্যকলাপের ছবি এতে স্বচক্ষে দেখা যায়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। আরো উন্নত যন্ত্র হল কালার ডপলার ইকো।

হার্টের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কতটা আছে তা পরীক্ষা করা হয় **টি এম টি** অর্থাৎ ট্রেডমিল টেস্ট মেশিনে। আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষার জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে **সিটি স্কেন**। এতে সিনেমার ছবির মত হার্টের কার্যকলাপের ছবি বেরিয়ে আসে।

হার্টের ভেতরটা পরীক্ষা করার জন্য ধমনীর মাধ্যমে পাইপ ঢুকিয়ে ঔষধের সাহায্যে হার্টের এক্সরে ছবি তুলে আনা হয়। এটাকে বলে **করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি**। বর্তমানে আরো উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে কোনরকম কাঁটাছেঁড়া ছাড়াই হার্টের ভেতরের ছবি তোলার যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরো অনেকরকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয় হার্টের ভেতরটাকে পরীক্ষা করার জন্য। হার্টের মাংসপেশির খবর জানার জন্যও নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার যন্ত্রও ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ দেশে হার্টের রোগীর সংখ্যা এত বাড়ছে যে শুধু হার্টের চিকিৎসার জন্যই পৃথক হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে। অবশ্য এখনো কিছু সংখ্যক মেঘা সিটিতেই এ ধরনের হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। হার্টের পরীক্ষা এবং চিকিৎসা দুটিই ব্যয়বহুল।

হার্টের চিকিৎসা

হার্টের চিকিৎসায় বর্তমানে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল (১) অ্যানজিওপ্লাস্টি, (২) বাইপাস (৩) ওপেন হার্ট সার্জারি, (৪) পেস মেকার বসানো।

অ্যানজিওপ্লাস্টি

করোনারি ধমনীর ভেতর চর্বির পলি জমে রক্ত চলাচলের পথ কতটা বন্ধ হয়েছে তা জানার জন্য অ্যানজিওগ্রাফি পরীক্ষা করার পর যদি দেখা যায় যে ধমনীর পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি অর্থাৎ আংশিক বন্ধ হয়েছে, তাহলে বড় কোন অপারেশন না করে পাইপের সাহায্যে ধমনীর ভিতর এক ধরনের বেলুন ঢুকিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে বেলুনটা ফুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ভেতরে জমে উঠা চর্বির পলি ধমনীর গায়ে চেপে যায় ফলে রক্ত চলাচলের পথ তৈরী হয়ে যায়। কাজ শেষ করে যন্ত্রের সাহায্যে বেলুনটা গুটিয়ে বের করে আনা হয়। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। আবার পলি জমে রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ হতে পারে। তাই দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। ধমনীর ভেতর বিশেষ ধরনের ঔষধ মিশ্রিত একটি ধাতুর স্টেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমটিকে বলে বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি এবং দ্বিতীয়টিকে বলে স্টেন্ট অ্যানজিওপ্লাস্টি। এই ব্যবস্থা সব রোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না। হার্টের অবস্থার উপরই তা নির্ভর করে।

বাইপাস সার্জারি

বাইপাস শব্দের অর্থ হল ঘুরপথ তৈরী করা। যেমন রাস্তার ক্ষেত্রে হয়। হার্টের যে রক্ত চলাচলের পথটা বন্ধ হয়ে গেছে সেটাকে ব্যবহার না করে রক্ত যাতে ভিন্ন পথে হার্টের ভেতর প্রবেশ করে হার্টের কাজ চালাতে পারে তার জন্য নতুন পথ করে দেওয়া হয়। শরীরের পা অথবা বুক থেকে শিরা কেটে

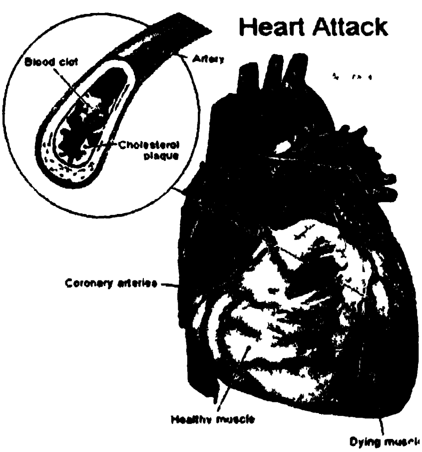
নিয়ে হার্টের মধ্যে দুটো ফুটো করে দুটি তারের মত নতুন শিরা সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে সেলাই করে দেওয়া হয়। এটাকে বলে বাইপাস সার্জারি। বর্তমানে এই অপারেশনে অনেক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

ওপেন হার্ট সার্জারি

বুকের মাঝখানে কেটে বুকের পাজর থেকে হার্টকে খুলে এনে হার্টের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বাদ দিয়ে সুস্থ করে তোলার যে চিকিৎসা করা হয় তাকে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি। এটা হল হার্টের চিকিৎসার চরম ব্যবস্থা। সবরকম অপারেশনের ক্ষেত্রেই রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব অপারেশনে দরকার উন্নত যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ সার্জেনদের একটি টিম।

পেস মেকার

হার্টের ডানদিকের উপরের অংশে একটা বিশেষ ধরনের পেশি আছে যেখানে আপনা থেকেই বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এর ফলে হার্টের স্পন্দন চলতে থাকে। প্রতি মিনিটে ৭২বার এই স্পন্দন চলে। এটাকে বলা হয় হার্ট বিট। কোন কারণে এই স্বাভাবিক পেশির পেস মেকার সেল কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে কৃত্রিম পেস মেকার যন্ত্র বুকে বসিয়ে হার্টের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। এটা একটি অমূল্য আবিষ্কার। এরফলে অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। তবে এটা স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয় যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। সময়মত বদল করতে হয়।



ক্যান্সার

দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষ ক্যান্সারের নাম শুনলেই আতংকে সংকুচিত হয়ে যেত। প্রতিদিন মৃত্যুর ভয় তাড়া করতো।

বর্তমানে অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। ক্যান্সারের অ্যানসার নেই। এই প্রবাদ বাক্যটিকে এখন অনেকটা পেছনে ঠেলে দিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। তবে ক্যান্সারের প্রকৃত কারণটা এখনো জানা যায়নি। তাই চিকিৎসা এখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিত অবস্থায় পৌছতে পারেনি।

ক্যান্সার সম্পর্কে যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হল ক্যান্সার জীবাণুঘটিত রোগ নয়। কাজেই এ রোগ সংক্রামক নয়। ছোঁয়াচে নয়। ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার এবং হার্টের মতই অঙ্গ বিকৃতির রোগ।

মৃত্যুর কারণ হিসেবে আধুনিক পৃথিবীতে হার্টের পরেই ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাপক গবেষণা। চিকিৎসা বিজ্ঞান নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন ঔষধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতির ক্রমাগত আধুনিকীকরণ।

ক্যান্সার রোগের বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসায় উন্নতি ঘটান যায়। অধিকাংশ রোগী দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল এখনো পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে না। এর অনেক কারণের মধ্যে কয়েকটি হল -

১) ক্যান্সার রোগের উপসর্গ অনেক রকমের হয়। রোগী তো দূরের কথা ডাক্তাররাই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না শরীরে কোথাও ক্যান্সার আছে কিনা।

২) অনেকেই লক্ষণ কিছু অনুমান করতে পারলেও ভয়ে ডাক্তার দেখান না বা ডাক্তারের কাছে সব কথা খুলে বলেন না।

৩) এ-দেশে রোগ নির্ণয় কেন্দ্র সংখ্যা এখনো প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু দাম খুব বেশী এবং ডাক্তার এবং টেকনিশিয়ানের সংখ্যাও খুব কম। তাই অনেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ নিতে পারেন না।

৪) আমাদের দেশে মেডিক্যাল চিকিৎসায় এখনো শতকরা ৮০ শতাংশ

ডাক্তার হলেন এম বি বি এস পাশ। তাদের উপরই অধিকাংশ মানুষের চিকিৎসা নির্ভর করে। কিন্তু এম বি বি এস কোর্সে ক্যান্সার বা হার্ট সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫) বেসরকারী উদ্যোগেও কম চিকিৎসা কেন্দ্র হচ্ছে। কারণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব, যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। বেসরকারী উদ্যোগ মানে ব্যবসা।

ক্যান্সারের কয়েকটি বিপজ্জনক লক্ষণ সবারই জানা থাকা দরকার।

১) পুরানো ঘা বা ক্ষত যদি কিছুতেই না সারে।
২) দীর্ঘদিন গলার স্বর ভেঙ্গে থাকে।
৩) দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার পর শুকনা কাশি যদি না সারে।
৪) খাবার গিলতে যদি মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।
৫) মাঝে মাঝেই যদি হজমে গণ্ডগোল হয়।
৬) শরীরের কোন তিল বা আঁচিলের যদি হঠাৎ পরিবর্তন হয়।
৭) মেয়েদের স্তনে বা শরীরের কোথাও যদি গুটলি দেখা দেয়।
৮) মলমূত্র ত্যাগের দীর্ঘদিনের অভ্যাস যদি বদলে যায়।
৯) দেহের কোন অংশে যদি হঠাৎ করে রক্তপাত হয়।
১০) মেয়েদের যদি বেশী বেশী রক্তস্রাব হয়।

এসব লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে। কারো ক্ষেত্রেই সবগুলো লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দেয় না। বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অন্য কোন কারণেও এসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ডাক্তারই ঠিক করবেন কোন জটিল রোগ আছে কিনা। প্রয়োজনবোধ করলে কোন ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রেও প্রাথমিক পরীক্ষা করানো যেতে পারে। তবে তা নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই তা করবেন। ক্যান্সার পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে অনেকে ভয় পান। এরূপ ভয় থাকা উচিত নয়। ভয় দূর করা এবং সময়মত চিকিৎসা করাই ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান কাজ। তবে ক্যান্সার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া উচিত নয়।

একটা কথা মনে রাখা দরকার ক্যান্সার রোগ হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। রোগ যখন ধরা পড়ে তারচেয়ে অনেক আগেই রোগের সূত্রপাত হয়। এমনকি

২০ বছর আগেই হয়তো রোগের সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু ধরা পড়েনি। যত দেরীতে রোগ ধরা পড়বে বিপদের আশঙ্কা ততই বেশী হবে।

আজকাল ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য অতি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। বায়োপসি, এণ্ডোস্কোপি, এক্সরে, স্ক্যানিং, আলট্রা সনোগ্রাফী এবং রক্ত পরীক্ষা প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করা হয়।

ক্যান্সার ধরা পড়লে পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য আরো উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সর্বত্র এসব পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ নেই।

ভারতে ৫০ লক্ষ ক্যান্সার রোগী আছে ।প্রতি বছর তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আরো অনেকের ক্যান্সার রোগ হয়তো ধরাই পড়ছে না। এদের ৯০ শতাংশই সময় মত চিকিৎসা কেন্দ্রে আসে না বা আসতে পারে না।

ক্যান্সার শরীরের যেকোন অঙ্গে হতে পারে। একটি অঙ্গ থেকে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অঙ্গে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্যই ক্যান্সার চিকিৎসা খুব কঠিন হয়।

একটি মাত্র কোষ থেকে মানব শরীরের সূত্রপাত হয়। ভ্রূণ অবস্থা থেকে কোষ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। অসংখ্য কোষ দিয়ে শরীর পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়।

শরীরের প্রতিটি কোষ পঞ্চাশবার ভাঙ্গতে পারে এবং বিভাজনের পর ৪৬টি ক্রোমোসোমে সেজে উঠে। মানব শরীরের ক্রোমোসোম সংখ্যা ৪৬টি।

কোন একটি কোষ অসুস্থ হলে কোষ বিভাজনের এই নিয়ম মানে না। ক্যান্সার কোষ কয়েকগুণ ক্রোমোসোম বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত ফোলে গিয়ে টিউমার সৃষ্টি করে। রক্তের মারফৎ এই দূষিত ক্যান্সার কোষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থা সৃষ্টির আগেই যদি রোগ ধরা পড়ে তবে ক্যান্সার রোগ ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া যায়। এটাই ক্যান্সারের প্রধান চিকিৎসা।

বিভিন্ন কারণে শরীরের কোষ দূষিত হয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যভ্যাস, পেশা এবং নেশা এই রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ।

ক্যান্সার আধুনিক যুগের রোগ নয়। পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে ক্যান্সার রোগে মৃত মানুষের মমি পাওয়া গেছে। ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কর্কট রোগের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিছু কিছু চিকিৎসা পদ্ধতির কথাও বলা আছে। কিন্তু কোন চিকিৎসাই এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে এই রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার সন্ধান দিতে পারেনি।

আধুনিক যুগে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। আগে কখনোই এমনটা দেখা যায়নি। তাই আধুনিক যুগে প্রায় ১০ কোটি মানুষ সারা পৃথিবীতে ক্যান্সার রোগে মারা যাচ্ছে। চিকিৎসার এত উন্নতি সত্ত্বেও এখনো মৃত্যুর হার খুব বেশী কমছে না। এর প্রধান কারণ ক্যান্সার রোগ প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ছে না। রোগ নির্ণয়ের উপায় আবিষ্কার হতে চলেছে। এটা বিশ্ববাসীর কাছে সুসংবাদ।

কিন্তু সব মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে রোগী খুঁজে বের করা কোন কালেই সম্ভব হবে না।

শরীরের যেকোন অঙ্গেই ক্যান্সার হতে পারে। দাঁতের মাড়িতে, জিহ্বায়, মুখে, ঠুঁটে, গলায়, স্বরযন্ত্রে, ফুসফুসে, হার্টে, লিভারে, পেনক্রিয়াসে, গলব্লাডারে, প্রোষ্টেট গ্ল্যান্টে, কোলনে, চামড়ায়, খাদ্যনালীতে, পাকস্থলীতে, মেয়েদের স্তনে ও জরায়ুতে ক্যান্সারের আক্রমণ খুব বেশী হচ্ছে।

তামাক জাতীয় খাবার ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। তামাক সেবন দুইভাবে হয়। (১) ধূমপান (২) তামাকের রস পান। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুঁকা যেকোনভাবেই তামাকের ধোঁয়া পান করা হোক তার বিষক্রিয়া সমান। তামাক চিবিয়ে রসপান করা, যেমন জর্দা, দোক্তা, পান মশলা যেভাবেই খাওয়া হোক সমান ক্ষতিকর। অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভার ক্যান্সার হয়।

মুখে গলায়, স্বরযন্ত্রে, ফুসফুসে, খাদ্যনালীতে এবং পাকস্থলীতে তামাকের বিষাক্ত নিকোটিন ক্যান্সার সৃষ্টি করে। যাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী তারা অনেক সময় রক্ষা পেয়ে যায়।

কোলন ক্যান্সার পরীক্ষার জন্য এণ্ডোস্কোপি একটি মূল্যবান আবিষ্কার। যারা মাছ মাংস পুড়িয়ে খায় তাদের কলোন ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার বেশী হয়। খাদ্যে অরুচি, কালো পায়খানা, রক্তাল্পতা ক্যান্সারের পূর্বাভাস। মাত্র কয়েক দশক আগে এণ্ডোস্কোপি মেশিনে পরীক্ষা করার সুযোগ এসেছে তাও সর্বত্র নেই। ভারতে এণ্ডোস্কোপি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর। খাদ্যনালী এবং পাকস্থলী (স্টমাক) ক্যান্সার এখন এণ্ডোস্কোপির সাহায্যে ধরা সহজ হয়েছে। প্রয়োজনে আলট্রাসনোগ্রাফি করে আরো নিশ্চিত হওয়া যায়। ক্যান্সার কোষগুলোকে এণ্ডোস্কোপির সাহায্যে কেটে বাদ দেওয়া যায়।

ফুসফুসের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশী লোক মারা যায়। তারপরেই পাকস্থলী

ও খাদ্যনালীর স্থান। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মেয়েদের স্তন ক্যান্সার। তারপরেই আছে জরায়ুর ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, প্রোষ্টেড গ্ল্যাণ্ড ক্যান্সার, গলার ক্যান্সার, মাড়ির ক্যান্সার ইত্যাদি।

ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে ৩টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যেমন -
১) ক্যামোথেরাপি (ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা)
২) অপরেশন করে ক্যান্সার কোষ বাদ দেওয়া।
৩) রেডিয়েশনের সাহায্যে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা

ক্যামোথেরাপি শুধু ক্যান্সার চিকিৎসায় নয় আরো অনেক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। শরীরের সব জায়গায় অপারেশন করা যায় না, বা রেডিয়েশনও সব জায়গায় সঠিকভাবে দেওয়া যায় না। রোগটা কোন জায়গায় আছে এবং কোন অবস্থায় আছে তা সঠিকভাবে জানার পর চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করা হয়। বেশীর ভাগ রোগী সঠিক সময়ে ডাক্তারের কাছে অসে না বলেই চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার আগেই রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা খুব ভাল হয়।

প্রস্টেট ক্যান্সার

সাধারণত ৫০ বছর বয়স পার হলে পুরুষের প্রস্টেট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রধানত চর্বিযুক্ত খাবার যারা বেশী খান তাদেরই প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

রোগের প্রথম পর্যায়ে উপসর্গ হল -

(১) ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া	(৫) মেরুদণ্ড বা কোমড়ে হাল্কা ব্যথা,
(২) প্রস্রাব আটকে যাওয়া	(৬) ক্ষুদা মন্দা,
(৩) প্রস্রাব মাঝে মাঝে রক্তবর্ণের হওয়া,	(৭) পা দুর্বল হওয়া ইত্যাদি।
(৪) মলান্ত্রে ব্যথা হওয়া,	

ইউরোলজিস্ট বিশেষজ্ঞরা রোগী পরীক্ষা করে প্রাথমিক ধারণা করতে পারেন। পরীক্ষায় যদি রোগ ধরা পড়ে তবে বুঝে নিতে হবে রোগ কোনস্তরে আছে। হরমোন থেরাপি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি অথবা প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়। খাবার নিয়ন্ত্রণ করে কিছুটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

স্তন ক্যান্সার

আজকাল কম বয়সেই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মহিলা। আমেরিকায় প্রতি দশজন মহিলার একজন স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। ভারতে এখনো সংখ্যাটা এত ব্যাপক না হলেও সাম্প্রতিককালে সংখ্যাটা বাড়ছে।

সাধারণত কুড়ি বছর বয়সের পরই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ৫০ বছর বয়সের পর এই ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

যাদের ১২ বছর বয়সের আগেই ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায় এবং অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তাদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া যাদের বেশী সন্তান হয় তাদের ঝুঁকি বেশী থাকে। যাদের কোন সন্তান হয় না তাদেরও ঝুঁকি বেশী। বেশী বয়সে সন্তান হলেও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে। যেসব মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ কম খাওয়ান, তাদেরও এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী। যারা চর্বিযুক্ত খাবার বেশী খান এবং শাকসব্জি কম খান তাদেরও এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী। নিজে নিজে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে কোথাও কোন গুটলি পেলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন।

জরায়ু ক্যান্সার

সারা বিশ্বেই জরায়ুর ক্যান্সার বাড়ছে। আমাদের দেশেও বাড়ছে। অপরিচ্ছন্নতার কারণে প্যাপিলোমা নামে একপ্রকার ভাইরাস সৃষ্টি হয়ে জরায়ুতে ক্যান্সার হয়। বেশী সন্তান প্রসবের কারণেও এই ক্যান্সার হয়।

বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুবন্ধ হবার পর রক্তস্রাব এই রোগের প্রধান লক্ষণ। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে জরায়ু কেটে বাদ দিলে সেরে যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় ধরা পড়লে জরায়ু কেটে বাদ দিয়ে রেডিয়েশন দিতে হয়। তৃতীয় অবস্থায় ধরা পড়লে জরায়ু বাদ দিয়ে রেডিয়েশন এবং কেমোথেরাপি দিয়ে অনেকটা ফল পাওয়া যায়। চতুর্থ অবস্থায় ধরা পড়লে বিশেষ কিছু করার থাকে না। জরায়ুর ক্যান্সার ওভারিতে ছড়িয়ে পড়লে ওভারিও কেটে বাদ দেওয়া হয়। এতে শরীরের পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না।

এইডস

সারা বিশ্বে আরেক ভয়ঙ্কর রোগের নাম এইডস। মাত্র ত্রিশ বছর আগে ১৯৮১ সালে এ রোগটি আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই

মহামারির আকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এ-রোগটি। যেকোন বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে যে কোন ব্যক্তি।

প্রধানত রক্তের মাধ্যমে রোগটি ছড়ায়। যৌন সংসর্গে এবং রক্তদানের মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত ছড়াচ্ছে। কিশোর, কিশোরী, যুবক-যুবতী ও মধ্য বয়স্ক নারী-পুরুষ এই রোগে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে।

এইডস রোগের চিকিৎসা এখনো খুব সফল হয়নি। গবেষকরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন নতুন ঔষধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কার করছেন। কিন্তু এখনো তেমন সাফল্য আসেনি।

তাই এখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জনচেতনা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এইডস দিবস পালন করা হচ্ছে।

কিন্তু পরিবারের কোন ব্যক্তি আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ বিশেষ সতর্ক হচ্ছে না। সেজন্যই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

এই রোগ ছোঁয়াছে নয়, সংক্রামকও নয়। তবু অকারণ আতংকে ভোগেন আক্রান্ত রোগীর নিকট আত্মীয়রা। এমনকি প্রতিবেশীরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন ফলে রোগী সঠিক যত্ন ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে সংকট আরো বাড়ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ভাইরাস রোগ প্রতিরোধে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে প্রত্যেক দেশের বিশেষ পরিবেশ অনুযায়ী ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে।

শরীরের রক্তে শ্বেত কণিকা রোগ প্রতিরোধের কাজ করে। এইডস রোগ শ্বেতকণিকার শক্তিকে অকেজো করে দেয়। ফলে এইডস রোগী কোন রোগের আক্রমণকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। অতি সাধারণ রোগেও এইডস রোগী কাবু হয়ে যায়। এটাই বড় সমস্যা। কাজেই এইডস নিজে কোন রোগ নয়, তবে যেকোন রোগের কারণ হয়ে উঠে এইডস।

এইডস রোগের কারণ

বিজ্ঞানীরা এইডস রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছেন যে মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধরনের সবুজ বানরের শরীরে এইডসের ভাইরাস ছিল। সেখানকার আদিবাসীরা সবুজ বানরের কাঁচা মাংস খেয়ে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকায় সমকামি পুরুষদের মধ্যে এই

রোগ সংক্রমণ শুরু হয়। পরে যৌন সংস্পর্শে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরাই এই ভাইরাসের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ আবিষ্কার করেছেন। ভাইরাসটির নামকরণ হয়েছে এইচ আই ভি। পুরো নাম হল হিউম্যান ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি।

অনেকে বলেন আমেরিকা যুদ্ধের জন্য জীবাণু অস্ত্র তৈরী করতে গিয়ে এই ভাইরাসটি সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর ভয়ঙ্কর সব রোগ জীবাণু ব্যবহার করে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে মহামারি রোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভয়ানক সব জীবাণু বোমা তৈরী করা হয়েছিল।

এইডস রোগের প্রধান লক্ষণ হল মানবদেহের সমস্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেওয়া। শরীরে এই ভাইরাস একমাত্র রক্তের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। একবার দেহে প্রবেশ করলে দশ বছরের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। সেবা, যত্ন, ঔষধ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগের প্রকোপ কম বেশী করা যায়। শুধুমাত্র অভিজ্ঞ ডাক্তাররাই রক্তের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করতে পারেন।

এইডস রোগীর গলা, বগল ও কুচকীতে বেদনাহীন স্ফীতি দেখা দেয়। ওজন কমে যায়, মুখে ও গলায় ক্ষত হয়, জ্বর হয়, পেট খারাপ হয়, গায়ে খুব ঘাম হয় বিশেষত রাত্রি বেলায়।

এইডস আক্রান্ত পুরুষের রক্ত ও শুক্র এবং নারীর রক্ত ও বুকের দুধের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। যৌন সংসর্গই বেশী আক্রমণ ঘটায়। এইডস রোগীর রক্ত অন্য কোন রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে রোগ ছড়িয়ে যাবে। নেশাগ্রস্ত এইডস রোগীরা সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীরে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করলে এই সিরিঞ্জের সূচ অন্য কেউ ব্যবহার করলে সেও আক্রান্ত হবে। এইডস রোগে আক্রান্ত মেয়েদের সন্তানও এইডস রোগী হয়ে জন্মায়।

মনে রাখা দরকার, এইডস মাত্র তিনটি পথে রোগ ছড়ায় রক্ত, শুক্র ও মাতৃদুগ্ধ। অন্য কোনভাবে এ রোগ ছড়ায় না। রোগীর হাঁচি, কাশি, কাপড়, চোপড়, বিছানাপত্র থেকেও রোগ ছড়ায় না। এইডস রোগীর সেবা যত্ন ও সহযোগিতার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের আন্তরিকভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত সেবা, যত্ন, ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য পেলে এইডস রোগী দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে। রক্ত পরীক্ষা না করে কখনো এ রোগ ধরা পড়ে না।

থ্যালাসেমিয়া

আমাদের দেশে প্রায় দশ কোটি মানুষ থ্যালাসেমিয়া রোগে ভুগছে। এটা এক ধরনের রক্তাল্পতা। অবশ্য ধরনটা আলাদা। থ্যালাসেমিয়া রোগীর শরীরে রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়।

অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতায় পুষ্টিকর খাদ্য এবং কিছু ঔষধ ব্যবহার করে সুস্থ থাকা যায়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পুরুষের ক্ষেত্রে ১২ এবং নারীর ক্ষেত্রে ১১ এর নীচে হলেই রক্তাল্পতা ধরা হয়। তিনটি কারণে রক্তাল্পতা দেখা দেয়- যেমন -

১) শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া।
২) শরীরে কম রক্ত তৈরী হওয়া।
৩) রক্ত যেটুকু তৈরী হয় তা তাড়াতাড়ি খরচ হওয়া।

মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবের কারণে রক্তপাত ঘটে। তাই মেয়েদেরই রক্তাল্পতা বেশী দেখা যায়। যেকোন বয়সেই রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। বাচ্চাদের খাবারে আয়রণ এবং ভিটামিনের ঘাটতি হলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। সুষম খাদ্য সকলের জন্যই প্রয়োজন। রক্তাল্পতা রোগীর চিকিৎসা হল সুষম খাদ্য, আয়রণ, ফলিক এসিড এবং ভিটামিন।

কিন্তু থ্যালাসেমিয়া মূলত রক্তাল্পতা হলেও এটা হল একটা জিনগত রোগ। এই রোগে আয়রণ নিষিদ্ধ। অথচ রক্তাল্পতায় আয়রণই প্রধান ঔষধ। থ্যালাসেমিয়ায় রক্তের হিমোগ্লোবিন দ্রুত ভাঙ্গতে থাকে। এজন্য রোগীকে মাঝে মাঝে রক্ত দিতে হয়। রক্তাল্পতা রোগে এই সমস্যা হয় না। কাজেই রক্ত পরীক্ষা না করেই থ্যালাসেমিয়া রোগীকে রক্তাল্পতা রোগী মনে করে চিকিৎসা শুরু করে দিলে বিপদ হতে পারে।

থ্যালাসেমিয়া তিন রকমের হয় -

১) থ্যালাসেমিয়া মেজর - বা বিটা থ্যালাসেমিয়া
২) থ্যালাসেমিয়া মাঝারি - বা ই-বিটা থ্যালাসেমিয়া
৩) থ্যালাসেমিয়া মাইনর

থ্যালাসেমিয়া মাইনর বিপজ্জনক নয়। অনেক সময় নিয়ম মেনে চললেই চিকিৎসার দরকার হয় না। ই-বিটা থ্যালাসেমিয়া মাঝারি ধরনের রোগে সঠিক চিকিৎসায় দীর্ঘকাল ভাল থাকা যায়। ভাল ঔষধ পাওয়া যায়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া-মেজর হল মারাত্মক। ঘনঘন রক্ত দিতে হয়। প্লীহা এবং লিভার বড় হয়ে যায়। সঠিক চিকিৎসা না হলে শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের শরীরে রক্ত তৈরী করে অস্থিমজ্জা। অর্থাৎ বোন ম্যারো। থ্যালাসেমিয়া রোগীর বোন ম্যারো অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরী করে। আমাদের প্লীহা এবং লিভার সুস্থ শরীরে তিন মাসে একবার হিমোগ্লোবিন ভাঙ্গার কাজ করে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগীর রক্তে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরী হলে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়।

এই রোগীর হিমোগ্লোবিনের আয়ু দুই মাসের বেশী থাকে না। বেশী বেশী হিমোগ্লোবিন ভাঙ্গতে বাধ্য হবার ফলে প্লীহা এবং লিভার খুব দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে আয়রণ বেশী জমে এবং হার্ট এবং প্যানক্রিয়াস আয়রণের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হার্ট ফেল হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সম্ভাবনা বিশেষভাবে থ্যালাসেমিয়া মেজরের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে মাঝে মাঝে রক্ত দিয়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে রক্ষা করা যায়। রক্ত পেলে প্লীহা এবং লিভার বিশ্রামের সুযোগ পায়। নতুবা লিভার ও প্লীহা আয়তনে বেড়ে গিয়ে বিপদ ঘটায়। কাজেই লিভার এবং প্লীহা বড় হবার আগেই চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার।

এসব রোগীর শরীরে ঘনঘন রক্ত দেওয়া এবং অতিরিক্ত আয়রণ শরীর থেকে বের করে দেবার চিকিৎসা ব্যয়বহুল। আজকাল স্পলনেকটোমি করে প্লীহা অপারেশন করে বাদ দেওয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হয়েছে। যেমন অপারেশন করে গলব্লাডার বাদ দেওয়া হয়। গলব্লাডার এবং প্লীহা কেটে বাদ দিলে শরীরের বড় রকমের ক্ষতি হয় না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন ঘটালে অনেকটা সুস্থ থাকা যায়।

থ্যালাসেমিয়া মেজর এবং থ্যালাসেমিয়া মাঝারি উভয় ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে প্লীহা অপারেশন করিয়ে নিলে ঘনঘন রক্ত দেবার দরকার হয় না।

থ্যালাসেমিয়া যেহেতু জিনঘটিত একটি রোগ সেহেতু এই রোগ সম্পূর্ণ সারে না। কিন্তু জিন চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হলে হয়তো সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেদিন হয়তো আর খুব বেশী দূরে নয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগীর বিয়ের ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন। স্বামী ও স্ত্রী

একজন যদি সুস্থ থাকে তবে সন্তান লাভে কোন বাধা নেই। কিন্তু দু'জনেই যদি এই রোগের শিকার হয় তবে সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত নয়।

আজকাল একটা কথা খুব চালু হয়েছে- বিয়ের বেলায় কুষ্ঠি বিচারের চেয়ে রক্ত পরীক্ষা জরুরী। কারণ এ দেশে প্রায় দশ কোটি মানুষের জিনে থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে। সঠিকভাবে পরীক্ষা করলে এই সংখ্যা আরো বাড়তেও পারে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের আরেকটি আধুনিক চিকিৎসা হল অপারেশনের সাহায্যে খারাপ বোন ম্যারো বদলে দেওয়া। এতে খরচ হয় ২০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশী। খুব কম লোকই এই চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারবে।

তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইপ্রাণে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য পাওয়া গেছে। পদ্ধতি গলো হল —

১) রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বিবাহ।

২) স্বামীর শরীরে রোগ না থাকলে সন্তানের জন্ম দেওয়া। দু'জনেই রোগী হলে কোন সন্তানের জন্ম না দেওয়া।

৩) বাড়িতে একজনের রক্তে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়লে পরিবারের সব সদস্যের রক্ত পরীক্ষা করে রোগ আছে কি নেই তা নিশ্চিত হওয়া এবং যারে শরীরে রোগ ধরা পড়বে তাদের বিবাহ সম্পর্কে সতর্কতা অলম্বন করা।

ভারতে খারাপ বোনম্যারো অপারেশনের সুযোগ রয়েছে তিনটি বড় হাসপাতালে— (১) দিল্লীতে এইমস হাসপাতালে, (২) মুম্বাইতে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে এবং (৩) ভেলোরে ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বহু হাসপাতালে। রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। বর্তমানে প্রতি বছরই চিকিৎসার ব্যাপক উন্নতি ঘটছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা উন্নত মানের ঔষধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি। সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে প্রসারিত হচ্ছে সহযোগিতার নানা সুযোগ-সুবিধা। তার সুযোগ নিতে হবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে।

চোখের রোগ

চোখ মানুষের অমূল্য একটি অঙ্গ। চোখ না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার। পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য অন্ধ লোকেরা দেখতে পায় না। জন্মান্ধ ছাড়াও যাদের চোখ থেকেও নেই, বিভিন্ন কারণে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাদের চেয়ে দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে নেই।

কোন মূল্য দিয়ে চোখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মৃত ব্যক্তির চোখ সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা আয়ত্ত করেছে এবং একজনের চোখ দিয়ে দু'জন দৃষ্টিহীন মানুষকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার কৌশল ও জ্ঞান অর্জন করেছে।

কিন্তু আমাদের সংস্কার এবং মানসিকতা অন্ধত্ব নিবারণের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃত মানুষের চোখ পেতে হলে আত্মীয় পরিজনের অনুমতি ছাড়া চোখ তুলে নেওয়া যায় না। তাই স্বেচ্ছায় চক্ষুদান করে সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন এবং মহত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্যে চক্ষুদান আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই যদি চক্ষুদান করে যান তাহলে মৃত্যুর পর কারো অনুমতির প্রয়োজন থাকে না। দেহদানের মতই চক্ষুদান একটি পবিত্র ও পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হয়।

ভারতের প্রায় দেড় কোটি মানুষ অন্ধত্বের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি ছিল অথচ কোন একটি রোগের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। উপযুক্ত চিকিৎসায় বেশীর ভাগ দৃষ্টিহীন মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। একটি চোখ পেলে দু'জনের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির চোখ সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সময়মত চোখ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেই। যেকোন হাসপাতালে চোখের এই চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই চোখ সংগ্রহ করার পর তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। তার জন্য সৃষ্টি হয়েছে চক্ষু ব্যাংক।

চক্ষু রোগীদের একটা বড় অংশই ভোগেন চোখের ছানিতে। বয়সের কারণেই বয়স্ক ব্যক্তিদের চোখে ছানি পড়ে। চোখের ভেতরের স্বাভাবিক লেন্সের অস্বচ্ছতাকে ছানি বলা হয়।

এছাড়া চোখের অন্যান্য রোগের মধ্যে প্রধান হল- (১) গ্লকোমা (২) কর্নিয়ার রোগ (৩) রেটিনার রোগ। যেকোন রোগের ক্ষেত্রেই চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করার অগ্রিম ব্যবস্থা হওয়া জরুরী। তাই চক্ষু শিবির থেকে শুরু করে

বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার এবং আলোচনা সভা করার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এখন সরকার ও সামাজিক সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে পালন করা হলে অনেকেই রোগ মুক্ত থাকতে পারেন। যেকোন দেশেই একজন অন্ধ মানুষ পরিবারের একটি বড় বোঝা হিসেবে গণ্য হয়। অন্ধ মানুষ রোজগার করাতো দূরের কথা, নিজের সব কাজ নিজে গুছিয়ে করতে পারে না।

ভারতে শিশুদের মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ শিশু অন্ধত্বের শিকার হয় অপুষ্টিজনিত কারণে এবং পরিবেশ দূষণ ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে। আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করতে পারে। এ দায়িত্ব নিতে পারে সরকার এবং সামাজিক সংস্থা।

তাছাড়া ছোট বড় সমস্ত হাসপাতালেই আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ এবং চিকিৎসা কর্মী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা সহ চক্ষু বিভাগ থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত বড় বড় শহরেই কিছু সংখ্যক বেসরকারী চক্ষু হাসপাতাল গড়ে উঠেছে যেখানে বিশ্বমানের চক্ষু চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সব হাসপাতালেই সম্ভব। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরাই প্রাথমিক পরীক্ষা করতে পারে।

আজকাল প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই চোখের ছানি অপারেশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নিরাপদ অপারেশনের সুযোগ এখনো খুব সীমাবদ্ধ কিছু হাসপাতালেই রয়েছে।

গ্লকোমা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির কোন ক্ষতি হবার আগেই গ্লকোমা রোগ ধরা যায়। জন্মগত বা বংশগত কারণে গ্লকোমা হতে পারে বা কোনরকম আঘাত বা ডায়াবেটিস-এর মত রোগের ফলে গ্লকোমা রোগ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার রোগ হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে আধুনিক চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা যায়।

রেটিনার রোগে লেসার অপারেশনের সাহায্যে রেটিনার দোষত্রুটি সংশোধন করা এবং চোখে কোন প্রকার সংক্রমণ হলে তা দূর করা সম্ভব।

কর্ণিয়ার কোন রোগে বা আলসারে চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের মাইক্রোবাইওলজি ল্যাবরেটরির প্রয়োজন হয়। তাও সব জায়গায় নেই।

তাছাড়া চোখের বাইরে চোখের পাতায় বা চোখের উপরের বাইরের চারদিকে যদি কোন জটিল রোগ হয় বা হাড় নরম হয়ে যায় তার চিকিৎসাও জরুরী।

চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন দামের লেন্স প্রয়োজন হয়। আজকাল লেন্স ছাড়াও যাতে কাজ চালানো যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। জটিল চিকিৎসা এখনো সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। এ বিষয়ে সরকার ও সামাজিক সংস্থাগুলোকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্য দায়িত্ব যারা নেবেন তাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, আজকাল প্রায়ই শোনা যায় স্বাস্থ্য শিবিরে চোখের ছানি অপারেশন করে অনেকে অন্ধ হয়ে গেছেন। এ ধরনের গাফিলতি শুধু অমানবিক নয় বরং অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। অনেকে বলেন, চোখের ছানি পাকলে অপারেশন করা ভাল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত হল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষ সার্জেনের দ্বারা অপারেশন করা উচিত।

চোখের ছানির একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন। কোন পদ্ধতিতে অপারেশান করা হবে তা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করতে হবে।

গ্লোকোমাও দৃষ্টি শক্তির নীরব ঘাতক। চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সারে না। তবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

চোখের ছানি

১) চোখের ছানি হল স্বাভাবিক লেন্সের অস্বচ্ছতা।

২) সাধারণত বয়সের কারণে চোখে ছানি পড়ে।

৩) ডায়াবেটিস রোগীর চোখে ছানি পড়ে।

৪) সাধারণত ৪০ বছরের পর চোখে ছানি পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৬০ বছরের পর দৃষ্টি শক্তি কমতে থাকে।

৫) চোখে ছানি পড়ার মূল লক্ষণগুলো হল- চোখে ঝাপসা দেখা, চোখের রং ফিকে হওয়া, উজ্জ্বল আলোতে অসুবিধা বোধ হওয়া, ঘনঘন চোখের চশমা বদল করতে বাধ্য হওয়া। একটি জিনিসের অনেকগুলো প্রতিচ্ছবি দেখা ইত্যাদি।

ছানির চিকিৎসা

ছানির কোন ঔষধ নেই। একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন। কয়েকটি নতুন পদ্ধতিতে অপারেশন অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। ১) আলট্রা সাউণ্ড শক্তির

সাহায্যে চোখের ভেতর ছানিটা গুড়ো করে দেওয়া হয়। এটাকে বলে ফেকো অপারেশন। ছানি পড়া লেন্সটি বাদ দিয়ে নতুন প্লাস্টিকের লেন্স বসান হয়। এটিই বর্তমানে সবচেয়ে নিরাপদ অপারেশন।

২) চোখের সাদা-কালো অংশের সংযোগস্থলে অপারেশন করে ছানি বের করে লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সেলাই লাগে। ফিকোতে সেলাই লাগে না।

৩) এডভান্সড ফেকোর চিকিৎসায় অপারেশনও লাগে না। ছানি অপারেশনের পর সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। দূরের জন্য চশমা লাগে না। কিন্তু পড়াশোনার জন্য চশমা লাগে। এটা পুরানো পদ্ধতির বেলায়। আধুনিক ফেকোতে শুধু ইনজেকশন দিয়ে ব্যথাহীন অপারেশন করা হয়। ব্যাণ্ডেজও লাগে না।

ছানি অপারেশনের আগে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। ব্লাডপ্রেসার, হার্ট, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনরকম জটিলতা আছে কিনা দেখতে হয়। সব ঠিকঠাক থাকলেই অপারেশন করা হয়।

গ্লকোমা

গ্লকোমা হল চোখের দৃষ্টি স্নায়ুর অসুখ, এতে রেটিনার কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। নীরবে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে থাকে। সময়মত সচেতন হলে এবং চিকিৎসা শুরু করলে দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ সারানো যায় না।

বংশগত কারণেও গ্লকোমা হয় আবার যারা দীর্ঘদিন ধরে বেশী পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করেন তাদেরও গ্লকোমা হতে পারে। হাই ব্লাডপ্রেসার বা থাইরয়েডের গণ্ডগোলের জন্যও গ্লকোমা হতে পারে। দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলেও গ্লকোমা হতে পারে। কোথাও কোন কারণে চোখে বড় রকমের আঘাত লাগলেও গ্লকোমা হতে পারে। আজকাল লেসার অপারেশনে চিকিৎসা কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ডায়াবেটিস এবং ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত রোগীদের চোখের রেটিনা ক্ষয় হতে থাকে। পরিণামে অনিবার্য অন্ধত্বের শিকার হয়। আগে এর কোন চিকিৎসা ছিল না। বর্তমানে লেসার চিকিৎসায় রেটিনার ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

হিমোফিলিয়া

মানব শরীরে জন্মসূত্রে পাওয়া আরেকটি জিন ঘটিত রোগ হল হিমোফিলিয়া। থ্যালাসেমিয়া রক্তের হিমোগ্লোবিন কমিয়ে দেয় আর হিমোফিলিয়া রোগে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা থাকে না। ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এমনকি শরীরের ভিতরে এবং বাইরে রক্ত ক্ষরণ হয়ে বিপদের সৃষ্টি করে।

থ্যালাসেমিয়া রোগে রক্তের অভাব পূরণ করার জন্য ঘনঘন রক্ত দিতে হয়। আর হিমোফিলিয়া রোগীর ক্ষেত্রে রক্ত জমাট বাধার বিভিন্ন ঔষধ দিতে হয়। এই রোগেরও চিকিৎসা ব্যয়বহুল হয়। সময়মত চিকিৎসা না হলে অঙ্গ বিকৃতি এবং পঙ্গু হবার সম্ভাবনা বেশী।

জিনগত এই দুইরকম রোগীরই বিয়ের ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরা হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত হন। আর মহিলারা হন বাহক। একজন সুস্থ পুরুষের সঙ্গে একজন বাহক মহিলার বিয়ে হলে তাদের সব পুত্রসন্তানই সুস্থ হবে কিন্তু কন্যাসন্তানেরা সবাই বাহক হবে।

জন্মের পর হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুর নাভি থেকে রক্ত ঝরে এবং বারবার শরীরের বিভিন্ন অংশে নীলাভ কালসিটে পড়ে। দাঁত ওঠা এবং দাঁত পড়ার সময় দীর্ঘ সময় ধরে রক্তপাত হয়। অস্থির সন্ধিতে যন্ত্রণা হয় এবং ফোলে যায়। এইসময় থেকেই রোগীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। যেকোন সময় রক্তপাত হলে রক্তজমাট বাঁধার ঔষধ দেওয়াই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

লিউকেমিয়া

রক্তের আরেক মারাত্মক রোগ হল লিউকেমিয়া। এটা হল রক্তের ক্যান্সার। ৩০ রকমের রক্তের ক্যান্সার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা। কিছু কিছু ব্লাডক্যান্সার আছে যেগুলো চিকিৎসায় ভাল হয়ে যায়। আবার কতকগুলো আছে যেগুলো ঔষধে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কিছু ব্লাড ক্যান্সার আছে যেগুলো ঔষধে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব কঠিন হয়।

আমাদের শরীরে প্রতিদিন নতুন ব্লাড সেল তৈরী হয় এবং পুরানো ব্লাড সেল নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই বলা হয় রক্তদান করলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। অল্পদিনের মধ্যেই নতুন রক্ত তৈরী হয়ে অভাব পূরণ করে দেয়। তবে

রক্তদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। একবারে বেশী রক্ত দিলে বিপদ হতে পারে। রক্তের কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তদান উচিত নয়।

ব্লাড ক্যান্সারের রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যায়, শরীরে রক্তক্ষরণ হয়, ইনফেকশন হয়। রক্ত যেহেতু সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেহেতু শরীরের সব অঙ্গেই ব্লাড ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে।

ব্লাড ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিষাক্ত বিকিরণ এবং কোন ভাইরাস সংক্রমণ থেকে ব্লাড ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আনবিক বোমার বিস্ফোরণে অসংখ্য মানুষ ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। ভারতের ভূপালে বিষাক্ত রাসায়নিক কারখানায় লিক হয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসায় অসংখ্য লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে আবার অসংখ্য লোক ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। এ দুটি দৃষ্টান্ত থেকে ব্লাড ক্যান্সারের একটি কারণ জানা গেছে। অন্যান্য ক্যান্সারের কারণ অনুসন্ধানের গবেষণা চলছে।

সাম্প্রতিককালে ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসায় অনেক উন্নত ধরনের ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। এখন ক্যামোথেরাপিতে চার পাঁচ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রেডিয়েশন বা অপারেশন করা হয়। মৃত্যু হার আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে।

অ্যানিমিয়া

রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলেই অ্যানিমিয়া হয়। একজন সুস্থ মানুষের দেহে পাঁচ লিটার রক্ত থাকে। রক্তে আয়রনের ভাগ কমে গেলে এবং রক্ত তৈরীতে সাহায্য করে যেসব উপাদান যেমন- ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-$_{১২}$ এসবের ঘাটতি দেখা দিলে অ্যানিমিয়া ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অস্থিমজ্জায় যেখানে রক্ত তৈরী হয় সেখানে রক্ত তৈরী হতে পারে না। প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাবে শরীর দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে যায়।

রক্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে যৌবন এবং সজীবতা। রক্তে তেজ কমে গেলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়। শরীরে জলের অভাব হলেও রক্তের জোর কমে যায়। রক্তের একটি প্রধান উপাদান হল জল।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য রক্তের পরিমাণ যাতে ঠিক থাকে সেরূপ সুষম খাদ্য খেতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম না করা যেমন

খারাপ তেমনি পরিশ্রম বেশী করাও খারাপ। রক্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গে অক্সিজেন এবং পুষ্টি যোগায়। রক্তের তিন রকম কোষ বা সেল থাকে। (১) লোহিত কণিকা, (২) শ্বেত কণিকা, (৩) অনুচক্রিকা। শ্বেত কণিকা রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি সৃষ্টি করে, অনুচক্রিকা, রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তের তিনটি প্রধান উপাদানের যেকোন একটির অভাব বা বিকৃতি ঘটলেই নানা রোগের সৃষ্টি হয়। রক্তকে চারটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয় এ-বি-এবি-ও। প্রত্যেকের রক্তের গ্রুপ জানা থাকা দরকার। জরুরী অবস্থায় রক্ত নিতে হলে রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী রক্ত সংগ্রহ করতে হয়। এখানে ভুল হলে বিপদ হয়।

বার্ধক্য রোগ

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয় বাড়তে থাকে। শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোনগুলোর ক্ষরণ বন্ধ হতে থাকে। শরীর এবং মন দুটিই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই নানা রোগে আক্রান্ত হতে থাকে।

বেশীর ভাগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার এবং হার্টের রোগে আক্রান্ত হন। দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। অনেকে অন্ধ হয়ে যান, কানে কম শুনেন বা অনেকে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যান। দাঁত পড়ে যায়। খাবার চিবিয়ে খেতে পারেন না। কথা বলতে কষ্ট হয়। কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। হাতের জোর কমে যায়। কোন কাজ ঠিকভাবে করতে পারেন না। পায়ের জোর কমে যায়, চলাফেরা করতে পারেন না। কোমরে ও পিঠে ব্যথা শুরু হয়। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দেয়। কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। লিভার, কিডনী ও প্যানক্রিয়াস, ফুসফুস ঠিকভাবে কাজ করে না।

এসব কারণে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যেকোন সংক্রামক রোগে সহজেই আক্রান্ত হন। নিজের কাজ নিজে করতে পারেন না বলে খুব অসহায় বোধ করেন।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেক সময় একসঙ্গে দু-তিনটি রোগে আক্রান্ত হন। ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার বা লো ব্লাডপ্রেসার, হার্ট, ফুসফুস, লিভার, প্যানক্রিয়াস, প্রেস্টেট গ্ল্যাণ্ড, চোখ, কান, দাঁত, মস্তিষ্ক, হাড়, বাত ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার এক বা একাধিক রোগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আক্রান্ত হন।

ফুসফুস ও হার্টের কোন না কোন রোগে প্রায় সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই ভোগেন। পেস মেকার, বাইপাস সার্জারি, ওপেন হার্ট সার্জারি, অ্যানজিওপ্লাস্টি

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বেশী হয়। বিভিন্ন রকম বাতের আক্রমণও বৃদ্ধ বয়সেই বেশী হয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সবচেয়ে মারাত্মক এবং অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কের স্মৃতিভ্রংশ রোগে। এই ডিমেনশিয়া রোগের মূল কারণ আলজেইমার অর্থাৎ ভুলে যাওয়া রোগ। এই রোগে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আচার-আচরণ সম্পূর্ণ বদলে যায়। কোন কিছুতে মনযোগ থাকে না। কোন কথা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। কোথায় আছেন বা কোথায় ছিলেন বুঝতে পারেন না। বাড়ীর ঠিকানাও ভুলে যান। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এ রোগ বেশী হয়। মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন হরমোন কমে যায় বলে মহিলারা বেশী আক্রান্ত হন। হরমোন চিকিৎসায় বর্তমানে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য পৃথক একটি বিভাগ তৈরী হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখার নাম জেরিয়াট্রিকস। কিন্তু কোন হাসপাতালেই এই বিভাগটি সঠিকভাবে চালু হয়নি। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অসহায় অবস্থায় পরিবারের সদস্যদেরই বেশী দায়িত্ব নিতে হয়। শেষ বয়সে একটু যত্নের জন্য কাতর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সমাজকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে। বৃদ্ধ বয়সে পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত রোগীরা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় নিঃসঙ্গতা খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়। শিশুর মত অসহায় হয়ে যান বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

ধূমপান না বিষপান

ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমছে না বরং বাড়ছে। বিড়ি, সিগার, সিগারেট, হুকা ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে। অর্থাৎ গ্রামে এবং শহরে সমানভাবেই একটা উদাসীন ভাব চলছে।

তাছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকের রস বিভিন্নভাবে চিবিয়ে রস পান করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। দুটিরই ফলাফল একইরকম। জর্দা, খৈনি, নস্যি, পানমশলা, দোক্তা যে আকারেই পান করা হোক মানবদেহে তার একইরকম প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়েছে।

তামাক একটি কৃষিপণ্য। কৃষি এবং শিল্পে অসংখ্য লোক নিযুক্ত রয়েছে। তাই হঠাৎ করে সব বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যারা ক্রেতা তাদেরকে সচেতন এবং সতর্ক করার জন্য সব দেশেই আইন করা হয়েছে তামাক জাতীয়

যেকোন পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে প্যাকেটের উপর সতর্ক বাণী ছাপতে হবে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

কার্যত কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তামাকের বিষাক্ত আক্রমণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৬০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। ভারতে দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় তামাকের কারণে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সী পুরুষ ও নারী। ক্যান্সার রোগীদের ৫০ পঞ্চাশই ধূমপান থেকে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

হার্ট এবং ফুসফুসের নানা রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও একটা বড় অংশই ধূমপায়ী। তাদের মধ্যে মৃত্যুর হারও বেশী।

তামাক চাষে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তামাকের রস জল দূষিত করে তামাকের ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে।

তামাক যেখানে গুদামজাত করা হয় তার আশেপাশে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এগুলো কোন অনুমান নয় প্রমাণিত সত্য।

যারা তামাক ব্যবহার করছেন, ধূমপান করছেন শুধু যে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয় যাদের নাকে মুখে তামাকের ধোঁয়া প্রবেশ করছে তারাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গ্রামীণ এলাকায় বহু বয়স্ক মহিলাও বিড়ি বা তামাক ব্যবহার করেন। শহরাঞ্চলেও বহু শিক্ষিতা নারীও সিগারেটের ধোঁয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পান করেন বা করতে বাধ্য হন। সবাই সমানভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই ধূমপান করছেন। তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছেন ছাত্রছাত্রীদেরও ক্ষতি করছেন।

এছাড়াও যেখানে সাধারণ মানুষের জমায়েত ও যাতায়াত বেশী যেমন যানবাহন, রেল বা বাস স্টেশান, প্রেক্ষাগৃহ, অফিস, আদালত, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কফি হাউস, ক্যান্টিন, হাসপাতাল, শপিংমল, ক্লাব, বার ইত্যাদি স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু দণ্ডদানের কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ না থাকায় ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করেই ধূমপান চলছে। এতে বুঝা যায় ধূমপান নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী নয়।

সারা বিশ্বে ৩১শে মে তারিখটি তামাক বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সতর্কতামূলক প্রচার ছাড়া এ দিবসটি পালনের অন্য কোন সার্থকতা নেই।

তামাকের মধ্যে প্রায় চার হাজার রাসায়নিক যৌগ রয়েছে যার মধ্যে অন্তত: পঞ্চাশটির ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। বদ্ধ ঘরে বা জনবহুল এলাকায় ধূমপান করলে সেখানে যারা থাকবেন তাদের সকলেই কমবেশী তামাকের বিষাক্ত ধোঁয়ার শিকার হবেন। শিশুদের অবস্থা হয় শোচনীয়। ধূমপান না করেও লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে ধূমপানের ক্ষতিকর আক্রমণের শিকার হয়ে যান।

এতসব ক্ষতিকর দিক জানা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদাসীন। কারণ তামাক শিল্প থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণ কর আদায় হয়। কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিচার করলে তামাকজাত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাখাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার তুলনায় সরকারের আয় নগণ্য বলা যায়। তাছাড়া তামাকজাত রোগের আক্রমণে কর্মক্ষম ব্যক্তিরাই বেশী মারা যায়। ফলে অভিজ্ঞ শ্রমশক্তির ক্ষয় হয়। তাতে সামগ্রিকভাবে দেশেরই ক্ষতি হয়।

তামাকের বিষাক্ত নিকোটিন শরীরে নেশা সৃষ্টি করে। তাই নেশাখোর ধূমপায়ীরা সহজে ধূমপান ছাড়তে পারেন না। ধীরে ধীরে ধূমপান্ ছাড়া যায় না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে হঠাৎ ধূমপান ছাড়তে হয়। সাময়িক কষ্ট হলেও ছাড়তে পারলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে এটা নিশ্চিত। নিকোটিনের বিষাক্ত প্রভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। কারণ নিকোটিন রক্তনালীর পথ সংকোচিত করে।

তামাকের কার্বন মনোকসাইড হার্টে অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করে। শ্বাসনালীরও ক্ষতি করে। যার ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। তাছাড়া তামাকের আলকাতরা ফুসফুসের নালীগুলোকে বন্ধ করে দেয়। তামাকের মধ্যে থাকে ফেনল জাতীয় পদার্থ যা ফুসফুসেরও সূক্ষ্ম চুলের মত নালিকাগুলোকে অসার করে দেয়। এর ফলে ফুসফুস বাতাস থেকে প্রাপ্ত ময়লা সাফ করতে পারে না। ধূমপান এবং তামাকের রস পান দীর্ঘকাল চলতে থাকলে শরীরের যেকোন অঙ্গে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া দরকার।

জলাতংক

জলাতংক প্রধানত পশুদের একটি রোগ। কুকুর, বিড়াল, বানর, ইঁদুর থেকে হাতি পর্যন্ত সব পশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। যেকোন উষ্ণ রক্তের প্রাণীই এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

কুকুর, বিড়াল, বানর ভারতে এই জীবাণুর মূল বাহক। এদের কামড়ে মানুষের শরীরে এই রোগের জীবাণু প্রবেশ করে। এই রোগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করলে জীবনের আশা থাকে না। মানুষের শরীরে পশুর কামড়ের পর ৩০ দিন থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত এই রোগ সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। চরম অবস্থায় রোগ প্রকাশ পেলে চিকিৎসার সুযোগ থাকে না।

পশুর কামড়ের পরই চিকিৎসা শুরু করতে হয়। আজকাল উন্নত ধরনের ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ভ্যাকসিন নিলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী হয়।

ভারতে প্রতি বছর ৬০/৭০ লক্ষ মানুষ পশুর আক্রমণের শিকার হয়ে ভ্যাকসিন গ্রহণ করে। অনেক গ্রামীণ মানুষ অজ্ঞতার কারণে সময়মত ভ্যাকসিন গ্রহণ করে না। ফলে এই রোগে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার মানুষ মারা যায় আমাদের দেশে।

পশুর কামড় ছাড়াও এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর লালা, ঘাম, মল, কিংবা দুধের মাধ্যমে বা নখের আচড়ে অন্যের শরীরে এই রোগের ভাইরাস প্রবেশ করে নীরবে মৃত্যু ডেকে আনে। ভারতে কুকুর, বিড়াল এবং বানরের আক্রমণেই এই রোগ বেশী ছড়ায়।

এই রোগের লক্ষণ হল জলের প্রতি আতংক। তাই এই রোগের নাম হয়েছে জলাতংক। জল ছাড়াও আলো এবং বাতাসের প্রতিও এই রোগীর আতংক সৃষ্টি হয়। শরীরে খিচুনি দেখা দেয় এবং কাঁপতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যায়। অতিরিক্ত লালা ক্ষরণ এবং অসারতায় শ্বাসযন্ত্র অচল হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

পশু চিকিৎসায় এবং চিড়িয়াখানায় যারা কাজ করেন তারা এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী। ভ্যাকসিন সময়মত নিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। একশ বছর যাবৎ লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। বর্তমানে আরো উন্নত ধরনের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কুকুর বা অন্য কোন পশু কামড় দিলে দেরী না করে ভ্যাকসিন নিতে হবে।

ভ্যাকসিন নেওয়া ছাড়াও পশুর কামড়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তার যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে। সাবান জলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে এন্টিস্যাপটিক মলম লাগাতে হবে। ধনুষ্টংকার যাতে না হয় তার জন্য টিটেনাস ইনজেকশান নিতে হবে।

আন্ত্রিক

আন্ত্রিক রোগ ভারতে জনস্বাস্থ্যের একটি বড় সমস্যা। পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর ২০ শতাংশের কারণ হল আন্ত্রিক। অবশ্য যেকোন বয়সেই এই রোগ হতে পারে।

আন্ত্রিক একটি সংক্রামক রোগ। অজ্ঞতার কারণেই দরিদ্র মানুষেরা এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অজ্ঞতার কারণেই এই রোগ একটি দরিদ্র পল্লীতে মহামারির রূপ নেয়। বিভিন্ন ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়া খাদ্য এবং পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ হল দারিদ্র, অপুষ্টি এবং অজ্ঞতা। সময়মত চিকিৎসার সুযোগ না নিলে মৃত্যুর কারণ হয়।

আন্ত্রিক রোগের ক্ষেত্রে দিনে তিনবারের বেশী পাতলা পায়খানা হলেই আন্ত্রিক রোগ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই রোগ সাময়িক হতে পারে আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। এক সপ্তাহের চিকিৎসায় সেরে যায়। কিছুটা জটিল হলে দুই সপ্তাহের চিকিৎসায় সেরে যেতে পারে। চিকিৎসার সুযোগ না নিয়ে জলপড়া, ওঝা বা বনজ লতাপাতার সাহায্য নিযে অপেক্ষা করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

আন্ত্রিক হলে ঘনঘন পাতলা পায়খানা হবার ফলে শরীরে জল ও লবণের প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দেয়। শরীরে জল ও লবণের অভাব পূরণের ব্যবস্থা না করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা থাকলে ডাক্তার দেখাবার আগেই জল ও লবণসহ সামান্য চিনি মিশিয়ে সরবত তৈরী করে বারবার খাওয়ালে রোগীর অবস্থা জটিল হয় না। রাষ্ট্রসংঘের ফর্মূলা অনুযায়ী সস্তা দামে খাবারের সেলাইনের প্যাকেট ও অর এস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো জলে গুলে রোগীকে বারবার খাওয়ালে রোগ জটিল রূপ নিতে পারে না।

যেকোন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসব রোগের চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। দুর্গম অঞ্চলের লোকদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে পারলে এসব রোগের আক্রমণ নিমূল করা সম্ভব। খাদ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা প্রয়োজন।

গলগণ্ড রোগ

আজকাল পৃথিবীর বহু দেশেই গলগণ্ড রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কারণ পরিবেশ দূষণের ফলে মাটি, জল এবং বাতাসে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রধানত: আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। আমাদের খাদ্যে শরীরের প্রয়োজনীয় আয়োডিন পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ পরিবেশ দূষণ। মাটিতে আয়োডিনের স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আয়োডিনের অভাবে শুধু গলগণ্ড রোগই নয়, মানুষের শরীর ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং থাইরয়েড গ্রন্থির থাইরক্সিন হরমোন সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে অঙ্গ সঞ্চালনে ব্যাঘাত, বাক শক্তিহীনতা, মানসিক সমস্যা, গর্ভপাতের সম্ভাবনা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সামুদ্রিক খাদ্যে প্রয়োজনীয় আয়োডিন পাওয়া যায়। কিন্তু তা সর্বত্র সহজলভ্য নয়। এজন্য লবণের মধ্যে আয়োডিন যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করলে আয়োডিন সংক্রান্ত রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করতে হবে।

পায়ে ঘা

পায়ে ঘা হলে তাকে চর্মরোগ মনে করে উপেক্ষা করলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। এমনকি পা কেটে বাদ দেবার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

সাধারণত পায়ে কোন ঘা হলে সাধারণ মানুষ কোন বনজ ঔষধ ব্যবহার করে। তাতে কাজ না হলে চর্মরোগের ডাক্তারকে দেখায়। গ্রামে হলে কোন হাতুড়ে ডাক্তার দেখায়। বিভিন্ন রকম এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করেও যখন কোন ফল পাওয়া যায় না তখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ পর্যন্ত হয়তো পা কেটে জীবন রক্ষা করতে হয়।

পায়ের কোন ক্ষত যদি অল্প দিনের মধ্যে শুকিয়ে না যায় তবে বুঝতে হবে এটা চর্মরোগ নয়। শরীরের শিরা বা ধমনীর দূষিত রক্ত জমে পায়ে ঘা হতে পারে। ডায়াবেটিসের কারণেও পায়ে ঘা হতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীর ব্যথার অনুভূতি কমে যায় তাই রোগ জটিল না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না।

পায়ের ক্ষত প্রাথমিক চিকিৎসায় না সারলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসল রোগ চিহ্নিত করতে হবে। ঔষধে না সারলে হয়তো শিরা ও ধমনীর বাইপাস অপারেশন করতে হবে। একই সঙ্গে

পায়ের যত্ন নিতে হবে। শরীরের ওজন কমাতে হবে। প্রতিদিন ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে এবং পায়ের ব্যায়াম করতে হবে।

প্রোস্টেট প্রদাহ

প্রোস্টেট গ্রন্থি শুধু পুরুষের শরীরেই থাকে। মেয়েদের শরীরে এই গ্রন্থি থাকে না। পুরুষের মূত্রাশয়ের নীচে কাঠ বাদামের আকৃতির এই গ্রন্থিটি থেকে প্রোস্টেট হরমোন ক্ষরণ হয়। এই হরমোনের অভাব থাকলে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে প্রোস্টেট গ্রন্থি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটা সাময়িক হতে পারে আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই শুক্রনালী এবং মূত্রনালী সংক্রমিত হয়।

প্রোস্টেটাইটিসের প্রধান লক্ষণ হল (১) হঠাৎ করে জ্বর হয়, তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। রোগী কাঁপতে থাকে। (২) পিঠের নীচে এবং তলপেটে ব্যথা হয় (৩) ঘনঘন প্রস্রাব হয় (৪) প্রস্রাব করতে কষ্ট হয়, জ্বালা হয়। (৫) রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়।

ক্রমে রোগ জটিল হলে প্রস্রাবের জ্বালা বেড়ে যায়। ভয়ে রোগী প্রস্রাব করতে চায় না। তলপেট ভারী মনে হয় এবং মলাশয়ে খোঁচা অনুভব করে। পায়খানা করতে ব্যথা হয়।

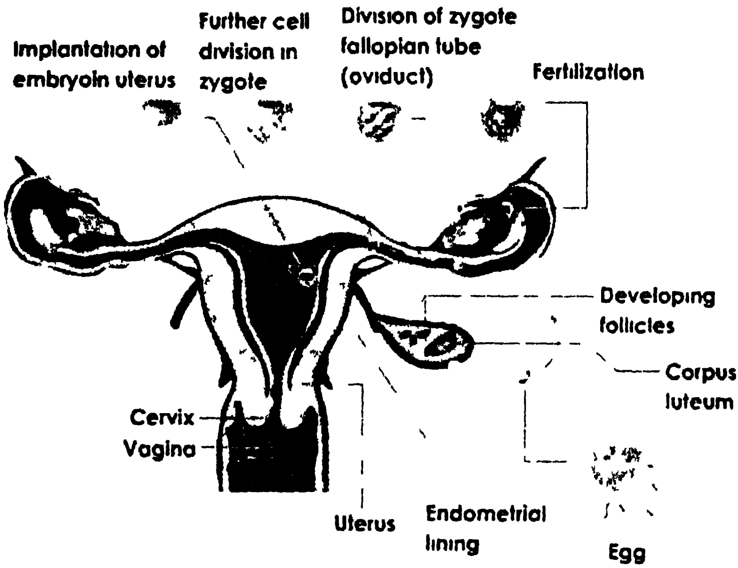
রোগীর প্রস্রাব কালচার করে রোগ জীবাণু চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর আক্রমণ ঘটতে পারে। সাধারণত তিনটি উপায়ে প্রোস্টেট গ্রন্থিতে জীবাণু প্রবেশ করে। (১) মূত্রনালীর উপরিভাগে সংক্রমণের মাধমে (২) প্রোস্টেট নালীতে সংক্রমিত প্রস্রাবের মাধ্যমে (৩) মলনালীর দূষিত রক্তের মাধ্যমে।

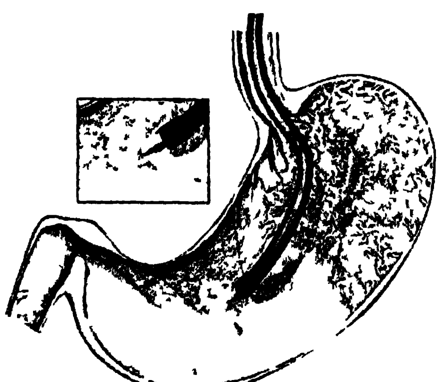
প্রস্রাব কালচাল করে জীবাণু চিহ্নিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। নতুবা নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। অন্তকোষে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইনফেকশন হলে প্রস্রাব আটকে যায়। তাই তলপেটের নীচে একটা নালী করে দেওয়া হয় যাতে প্রস্রাব পরিষ্কারভাবে করা যায়। মূত্রনালীর পথে নল ঢুকানো উচিত নয়। তাতে ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর অসাবধানতার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ চলতে থাকে। রোগ নির্ণয় সময়মত না হবার ফলে ক্রমশ: জটিলতা

বাড়তে থাকে। মূত্রনালীতে একই জীবাণুর বারবার আক্রমণ ঘটতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রস্রাব কালচার করেই রোগ নির্ণয় করতে হয়।

অনেক সময় চিকিৎসা শুরু হবার পর কিছুটা ভাল বোধ করলেই রোগী ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে রোগটা ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায়। অনেকের প্রোস্টেট গ্রন্থিতে স্বচ্ছ পাথর সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করালে পাথর বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অপারেশন করতে হয়। অপারেশনের আগে জীবাণু বিরোধী এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেতে হয়। ডাক্তারের পরামর্শমত চললে অপারেশনের পর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠা সম্ভব।





পেপটিক আলসার

মনে রাখবেন

১) স্বাস্থ্য সচেতনতার মূল কথা হল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সচেতন হওয়া।
২) যেকোন রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।
৩) বিজ্ঞাপন দেখে কোন ঔষধ খাবেন না।
৪) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে কোন খাবার খাবেন না।
৫) সর্বদা বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করবেন।
৬) পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা সবাই কম বেশী দায়ী।
৭) ঘরের আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে দিলে পরিবেশ দূষিত হয়।
৮) পুকুরে আবর্জনা ফেললে জল দূষিত হয়।
৯) বাসনপত্র ধোয়ার জন্যও বিশুদ্ধ জল দরকার।
১) শাকসব্জি ধোয়ার জন্যও পরিষ্কার জল দরকার।
১১) রান্নাতেও বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে।
১২) সব আবর্জনা নদীতে ফেললে নদীর জলও দূষিত হয়।
১৩) দূষিত জলের মাছও দূষিত হয়।
১৪) বহু রোগ জীবাণু আছে যারা আগুনের তাপেও ধ্বংস হয় না।
১৫) টিউবওয়েলের চারপাশে সাবান দিয়ে কাপড় কাছলে টিউবওয়েলের জলও দূষিত হয়।
১৬) স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতি হল পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ, পরিমিত পরিশ্রম ও পরিমিত বিশ্রাম।
১৭) গ্রামীণ প্রবাদ উনাভাতে দুনা বল ভরাভাতে রসাতল সর্বাংশে সত্য।
১৮) চর্বিযুক্ত খাবার কম খান, শাকসব্জি বেশী খান।
১৯) সস্তা দামের সবরকম মরসুমী ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।
২০) প্রতিদিন সকালে বা বিকালে নিয়ম করে হাঁটা এবং হাল্কা ব্যায়াম করুন।
২১) প্রতিদিন ৪/৫ লিটার বিশুদ্ধ জল পান করতে হবে।
২২) প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে।
২৩) প্রতিদিন ৮ ঘন্টা ঘুমাতে হবে। খাওয়ার পর একটু হাঁটতে হবে।
২৪) খালি পেটে চা খাবেন না। বারবার চা খাবেন না।
২৫) ধূমপান এবং মদ্যপান বর্জন করতে হবে।

২৬) পানের সঙ্গে সুপারি বা মশলা খাবেন না। জর্দা অবশ্যই বর্জন করবেন।
২৭) কোন কোন ঔষধ সারা জীবন খেতে হয়। হঠাৎ বন্ধ করলে বিপদ হয়।
২৮) রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। পুরো মাত্রায় না খেয়ে মাঝখানে বন্ধ করলে রোগ জীবাণু দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ করবে। তাতে বিপদ বাড়বে।

কি করবেন

১) কারো পায়ে কাঁটা বা পেরেক ফুটে গেলে বা কাঁচের টুকরো ঢুকে গেলে মাথায় ছিদ্রওয়ালা একটা চাবি বা এরকম কিছু দিয়ে আহত স্থানে চেপে ধরে তুলে নিন তাহলে ভেতরের কাঁটা, পেরেক বা কাঁচের টুকরো সহজেই হাত দিয়ে টেনে তুলতে পারবেন। তারপর চিকিৎসা।
২) কিছু খাবার পর হঠাৎ বমি বমি ভাব হলে কয়েকটি এলাচ অথবা জোয়ান চিবিয়ে খান। অথবা কাগজি লেবু কেটে গন্ধ নাকে টানুন। কাগজি না থাকলে লেবু গাছের কচি পাতা ছিঁড়ে গন্ধ টানুন। বমি বমি ভাব সেরে যাবে।
৩) হঠাৎ কাশি বেড়ে গেলে এবং দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকলে বিশুদ্ধ পানীয় জল একগ্লাস একটু গরম করে অল্প অল্প করে চায়ের মত পান করুন। কাশি কমে যাবে। গরম চা খেলেও কমবে। উঁচু বালিশে শোবেন। ভাল ঘুম হবে, কাশিও কমে যাবে।
৪) কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়ে যদি বদহজম হয় তবে এক গ্লাস গরম জলে অল্প লবণ মিশিয়ে চায়ের মত অল্প অল্প পান করুন। বেশী বদহজম হলে লবণের মাত্রা একটু বেশী দিলে একটু বমি হয়ে পেট হাল্কা হয়ে যাবে। তাতেও বমি না হলে লেবুর সরবত করে তাতে একটু সোডিয়াম বাই কার্বনেট মিশিয়ে খাওয়ালে পেট ব্যথ্য কমে যাবে, পেটের অস্বস্তিও কমবে।
৫) দাঁতের মাড়ি ফোলে গিয়ে যন্ত্রণা হলে এক টুকরো আদা মুখে রাখুন। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা কমে যাবে।
৬) দাঁতে যদি যন্ত্রণা হয় তবে ক্ষয় হয়ে যাওয়া দাঁতে দুটো লবঙ্গ ভেঙ্গে বা থেঁতো করে দিয়েদিন। যদি সম্ভব হয় চিবিয়ে লবঙ্গের রসটা দাঁতে রাখতে পারলে যন্ত্রণা কমে যাবে।

৭) রাতে হঠাৎ কারো বমি শুরু হলে হাতের কাছে কোন ঔষধ না থাকলে একটু লবণ গরম করে জলে গুলে খেলে বমি কমে যাবে।

৮) রাতে হঠাৎ জ্বর বেড়ে গেলে ডাক্তার ডাকার সুযোগ না থাকলে বা ঘরে জ্বর কমানোর ঔষধ না থাকলে ঠাণ্ডা জলে অল্প লবণ গুলে সেই জলে তোয়ালে ভিজিয়ে জল ঝেড়ে নিয়ে কপালে রাখলে জ্বর কমে যাবে। সকালে ডাক্তার দেখাবেন বা ঔষধের ব্যবস্থা করবেন।

৯) কাজের শেষে ঘরে ফিরেই মাথায় যন্ত্রণা হলে চন্দন বা আদা বেটে কপালে লাগাতে হবে। তাহলে যন্ত্রণা কমবে। ঘরে ঔষধ থাকলে ঔষধ খাবেন। বেশী যন্ত্রণা হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

১০) কারো মাথায় সর্দি বসে গিয়ে মাথা ভারীবোধ হলে অল্প গরম জলে সামান্য লবণ মিশিয়ে কয়েকদিন স্নান করলেই সর্দি কমে গিয়ে মাথা হাল্কা হবে।

১১) শরীরের কোথাও ফোঁড়া হলে ফোঁড়া না ফাটার জন্য যদি বেশী যন্ত্রণা হয় তবে অল্প ঘি দিয়ে হলুদ বাটা বা গুঁড়ার সঙ্গে পেঁয়াজ মিশিয়ে ভেজে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফেটে যাবে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১২) কোন পোকা মাকড় বা বিছের কামড়ে খুব যন্ত্রণা হলে ফিটকারি জলে ভিজিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিন, অথবা লেবুর রসে চুন মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিন। যন্ত্রণা কমে যাবে।

১৩) কাঁচা আমের কুশি একটি পাত্রে পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। রান্না করতে বা অন্য কোনভাবে শরীরের কোন জায়গা আগুনে পুড়ে গেলে তা লাগিয়ে দিলে ফোস্কা পড়বে না।

১৪) মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে ছোট দুটো এলাচ চিবিয়ে খাবেন। বমিভাব, মাথা ব্যথায় এবং চোখের সমস্যায় এলাচ খুব উপকারী।

১৫) ক্ষিদে কমে গেলে গোল মরিচের গুঁড়োর সঙ্গে একটু আদার রস এবং মধু মিশিয়ে খেলে ক্ষিদে বাড়বে, গলার কষ্ট থাকলে তাও দূর হবে, লিভারের শক্তিও বাড়বে।

১৬) পেট পরিষ্কার করার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলে ইসবগুল ভিজিয়ে মাঝে মাঝে পান করুন।

১৭) বেশী কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে ইসবগুল এককাপ গরম দুধে গুলে নিয়ে এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে খেতে হবে।

১৮) অনেক দিন ধরে সর্দিতে কষ্ট পেলে দারচিনি, গোলমরিচ ও আদা বেটে নিয়ে জলে সেদ্ধ করে ঔষধের মত খেলে সর্দি সেরে যাবে।

১৯) ছোট এলাচ বেঁটে নিয়ে আমলকির রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরের জ্বালা এবং প্রস্রাবের জ্বালা কমে যাবে।

২০) কাশির দমক কমাবার জন্য একটি লবঙ্গ মুখে রেখে চুষতে থাকুন। কাশির উপশম হবে। প্রতিদিন একটি লবঙ্গ চুষে বা চিবিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট কমে যাবে।

২১) আদা শুকিয়ে হাতের কাছে রাখুন বদহজম হলে বা কফ ও বায়ু বৃদ্ধি হলে শুকনো আদা চুষে খান। উপকার পাবেন।

২২) মেথি গুঁড়া করে ঘিয়ে ভেজে গুড় দিয়ে ছোট ছোট লাড্ডু তৈরী করে প্রতিদিন সকালে একটি করে লাড্ডু খান বদহজমের ভয় থাকবে না।

কেন করবেন

১) সারা জীবন সুস্থ থাকতে হলে স্বাস্থ্য সচেতন হতেই হবে।

২) দীর্ঘ জীবন লাভের একমাত্র উপায় স্বাস্থ্য সচেতনতা।

৩) মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান ঔষধি গুণসম্পন্ন খাদ্য আবিষ্কার।

৪) কোন খাদ্যের কি গুণ তা জানা থাকলে নীঃরোগ জীবন লাভ করা যায়।

৫) শাকসব্জি ও ফল-ফুলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই কিছু বেশী খেলে ক্ষতি নেই।

৬) পরিমিত আহার মানে যেটুকু সহজে হজম হয়।

৭) পরিমিত পরিশ্রম মানে যেটুকু পরিশ্রম শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সচল ও সজীব রাখে।

৮) পরিমিত বিশ্রাম মানে যেটুকু বিশ্রাম না পেলে সব অঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ে।

৯) আমাদের খাদ্যবস্তুর ছয় প্রকার রস আছে (১) অম্ল (২) মধুর (৩) তিক্ত (৪) কষায় (৫) লবণ (৬) কটু।

১০) সুষম খাদ্য বলতে ছয়টি রসের সমন্বয় ঘটিয়ে খাদ্য নির্বাচন।

১১) রাত্রিবেলায় ভুরিভোজন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই লোভ সামলে চলতে হবে। কারণ অতিলোভে জীবন নাশ হয়।

১২) যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে সুষম খাদ্য এবং শরীর চর্চা এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা।

১৩) খালি পেটে জল এবং ভরা পেটে ফল খেলে শরীর ভাল থাকে।

১৪) খাদ্যবস্তু ভাল করে চিবিয়ে খেতে হয় তাহলে সহজে হজম হয়।

১৫) সংযত জীবনযাত্রা সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুস্থ মন, বুদ্ধি ও আত্মশক্তি বিকাশের জন্যও প্রয়োজন।

১৬) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার অক্ষমতাই অসুস্থতা। শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও প্রাণায়ম শরীরকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে।

১৭) বায়ু হল দেহের প্রাণশক্তি ও প্রাণকোষের নির্মাতা। তাই বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করতে যত্নবান হতে হবে।

১৮) জল শরীরের যাবতীয় তরল রস সৃষ্টি ও পরিচালনা করে, তাই বিশুদ্ধ জল পান স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

১৯) রস, রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতুর- সারবস্তু হল জীবনীশক্তি। এই শক্তি নষ্ট হলে বা ভারসাম্য না থাকলে শরীর ভেঙ্গে পড়ে, অকাল বার্ধক্য দেখা দেয়।

২০) মধ্য বয়স থেকেই শরীরের রস অর্থাৎ হরমোন ক্ষরণ কমতে থাকে। এই সময় থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম মেনে চললে অকাল বার্ধক্য ঠেকানো যায় এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

২১) পাকস্থলীতে খাদ্য না পড়লে পাচকরস নিঃসৃত হয় না। খাদ্য ভালভাবে চিবিয়ে খেলে সহজেই হজম হয়।

২২) মাঝে মাঝে উপবাস শরীরের পক্ষে ভাল। পাকস্থলি এবং লিভার মাঝে মাঝে বিশ্রাম পেলে হজমশক্তি বেড়ে যায়। পেটে অম্লরস, গ্যাস এবং অজীর্নতা দোষ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২৩) বিভিন্ন দ্রব্য একসঙ্গে খেলে অম্লরস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হজম শক্তির মাত্রা অনুযায়ী ভোজন করা উচিত। বিরুদ্ধ আহার ক্ষতিকর। মাংসের সঙ্গে দুধ খাওয়া উচিত নয়।

২৪) যার যেমন কাজ তার তেমন খাদ্য প্রয়োজন।

খাদ্য, পথ্য, ঔষধ

মানুষ একসময় সর্বভুক প্রাণী ছিল। বন্যপশুর সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে ভাল মন্দ খাদ্য বাছাই করার দক্ষতা অর্জন করেছে। কৃষি সভ্যতা শুরু হবার পরই খাদ্য উৎপাদন করার নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করার এবং খাদ্যগুণ বিচার বিশ্লেষণ করার কৌশল আয়ত্ত করেছে। কৃষি সভ্যতাই মানুষকে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার পথ দেখিয়েছে। মানব সমাজে সৃষ্টি হয়েছে কর্ম বিভাগ।

অসুখ বিসুখে বনজ ঔষধ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে কর্ম বিভাগের ফলেই। অসুস্থ অবস্থায় সহজপাচ্য খাবার বা পথ্য ব্যবহারের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে সুদীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আধুনিক যুগেও অবিরাম এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে মানুষের জীবনকে সুখী, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভের পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে।

আধুনিক যুগের স্বাস্থ্য সচেতনতা মানুষকে সুখী ও সুস্থ রাখারই উদ্যোগ। বর্তমানে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশী উন্নত এবং অনেক বেশী নিখুঁত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা এক অসাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

আমাদের খাদ্য, পথ্য এবং ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। তবু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশ খাদ্য রুচিতে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তাতে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু বৈষম্য তৈরী হয়ে যায়। আগামীদিনে তা আরো নিখুঁত হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সে বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশের অধিকাংশ মানুষ শাকসব্জি, মাছ, মাংস ও ফল খেতে অভ্যস্ত হয়েছে। এসব খাদ্যের বিভিন্ন স্বাদ এবং প্রজাতিগত পার্থক্য থাকলেও বিজ্ঞান শুধু খাদ্যগুণকেই বিচার করে।

অসংখ্য প্রজাতির মাছ, মাংস, শাকসব্জি আছে। যেখানে যে প্রজাতির মাছ, মাংস, শাকসব্জি সহজলভ্য সেখানে সে ধরনের খাদ্যই প্রচলিত হয়। খাদ্য বিশারদরা পরিবেশ অনুযায়ী খাদ্য ও পথ্য নির্বাচন করেন। তাদের পরামর্শ মেনে চললে সুস্থ থাকার পথ সহজ হয়।

পৃথিবীতে যত রকমের মাছ আছে বিজ্ঞানীরা তাদেরকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন- (১) মিষ্টি জলের মাছ (২) সামুদ্রিক মাছ।

মিষ্টি জলের মাছ হল নদী, খাল, বিল, ঝিল, পুকুর ও ডোবায় যেসব মাছ হয়। আর সমুদ্রের যাবতীয় মাছ সামুদ্রিক মাছ হিসেবেই গণ্য হয়।

বিজ্ঞানীদের উপদেশ হল নোংরা জলের মাছ খাওয়া উচিত নয়। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী যেকোন মাছ টাটকা অবস্থায় কম তেল ও কম মশলা ব্যবহার করে রান্না করে খেতে হবে। কাঁচা মাছে নানা রোগের জীবাণু লুকিয়ে থাকতে পারে। রান্না করলে আগুনের তাপে জীবাণুরা ধ্বংস হবে।

নদীর মাছে স্বাদ বেশী, কিন্তু সমুদ্রের মাছে পুষ্টি বেশী। শুধু তাই নয় সামুদ্রিক মাছে এমন কিছু উপাদান আছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ নামের ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা হার্টকে সুস্থ রাখে, রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, ধমনীর ভেতরের দেওয়াল সুরক্ষিত রাখে।

সবরকম মাছ সহজ পাচ্য। কিন্তু বেশী খেলে ক্ষতি হবেই। মাছের ভিটামিন হার্ট এবং চোখের পক্ষে খুবই উপকারী। তাছাড়া সামুদ্রিক মাছে প্রচুর আয়োডিন থাকে যা থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

মিষ্টি জলের মাছও খুব উপকারী। যারা দীর্ঘকাল ধরে ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন তাদের পক্ষে মিষ্টি জলের মাছ নিরাপদ। কারণ সামুদ্রিক মাছের আয়রণ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। তবে মনে রাখতে হবে মাছের ঝোল উপকারী কিন্তু কড়া ভাজা মাছ অপকারী। যার যার পছন্দ মত মাছ খান। কিন্তু মাছের ভিটামিন ও খাদ্যগুণ রক্ষা করে মাছ রান্না করতে হবে। তেল মশলা শরীরের পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু অতিরিক্ত তেল মশলা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মাংসের বেলায় বলা যায় পাখীর মাংস সহজপাচ্য কিন্তু পশুর মাংস গুরু পাক। যেকোন মাংস বেশী খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আধুনিক যুগের মানুষ গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, ঘোড়া, উট ইত্যাদি নানা পশুর মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সবরকম পশুর মাংস বাচ্চা অবস্থায় সহজপাচ্য কিন্তু বেশী বয়স হলেই রুক্ষ এবং হজমের পক্ষে কষ্টকর হয়।

অসুস্থ মানুষের পক্ষে মাছ, মাংস অত্যন্ত সহজপাচ্য অবস্থায় সুসিদ্ধ করে

খাওয়াই শ্রেয়। কারণ অসুস্থ মানুষের হজম শক্তি কমে যায়। বয়স্ক এবং শিশুদের খাদ্যও সহজপাচ্য হওয়া প্রয়োজন। এই সহজপাচ্য খাবারকেই বলা হয় পথ্য। শরীরের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ফল খেয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

টাটকা শাকসব্জিও রান্নার গুণে সহজপাচ্য হতে পারে আবার গুরুপাকও হতে পারে। তিনিই সুগৃহিণী যিনি সকলের উপযুক্ত করে সুস্বাদু রান্না করতে পারেন। গুরুপাক রান্নার মূল উদ্দেশ্য থাকে সুস্বাদু করা। কিন্তু সহজপাচ্য রান্নাও সুস্বাদু হতে পারে তবে তা নির্ভর করে রান্নায় অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার উপর।

মানুষের যাবতীয় খাদ্যের মধ্যেই কিছু না কিছু ঔষধিগুণ রয়েছে। শরীরের ভেতর খাদ্যবস্তুর বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের পুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয়। কোন একটি খাদ্য সব উপাদান সরবরাহ করতে পারে না। তাই মিশ্র ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

তাছাড়া যেসব ঔষধিগুণ সম্পন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না সেগুলোর বিশেষ বিশেষ গুণকে ঔষধ হিসেবে তৈরী করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রোগে প্রয়োগ করা হয়।

কবিরাজ ও বৈদ্যরা বড়ি, সালসা ও আচার রূপে নানারকম ঔষধ তৈরী করেন। হোমিওপ্যাথিতেও বিভিন্ন পদ্ধতির ঔষধ তৈরী হয়। ডাক্তার, বৈদ্য ও কবিরাজরাই সঠিক ঔষধটি নির্বাচন করে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।

এলোপ্যাথি ঔষধ নানা ধরনের হয়। টেবলেট, ক্যাপসুল, দ্রবণ, সাসপেনশান, অ্যালেকজির ইনহেলার, ড্রপ, মলম, ক্রিম, লোশন, জেল, ইনজেকশান ইত্যাদি। কোন ঔষধ কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তারও বিশেষ নির্দেশিকা থাকে।

অনেকে ডাক্তারের নির্দেশ না মেনে বিপদ ডেকে আনেন। কোন ঔষধ খাওয়ার আগে খেতে হয় আবার কোন কোন ঔষধ খাওয়ার পরে খেতে হয়। কিছু ঔষধ খালি পেটে খেতে হয়। ইত্যাদি নির্দেশের পেছনে বিশেষ কারণ আছে।

ইনজেকশানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশান পুশ করতে হয়। সুচও বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনটা চামড়ার নীচে, কোনটা মাংসপেশীর ভেতরে, কোনটা সরাসরি শিরাতে, কোনটা ব্রেনে, কোনটা স্পাইনালকর্ডে পুশ করতে হয়। নানা ধরনের ইনজেকশান দেবার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। সবাই সবরকম ইনজেকশান পুশ করতে পারেন না। ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন ইনজেকশান নিতে হয়। চামড়ার নীচে নিজে নিজে পুশ করার পদ্ধতি

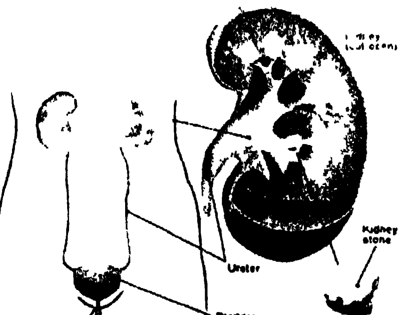
সহজেই জেনে নিতে পারেন। আজকাল কলমের মত ইনজেকশান পাওয়া যায়। একটু চাপ দিলেই ঔষধ চামড়ার নীচে চলে যায়।

নাকে, চোখে ড্রপ দেওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মেয়েদের যোনিপথে নানা ঔষধ পুশ করতে হয়। বা পায়ুপথে ঔষধ পুশ করতে হয়। একটু প্রশিক্ষণ নিলেই নিজেরা এসব ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন।

টেবলেট এবং ক্যাপসুলের সবটাই ঔষধ নয়। বিভিন্ন উপাদান মেশান থাকে ঔষধটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য। কোন ঔষধ দ্রুত কাজ করা দরকার, আবার কোন ঔষধ ধীরে ধীরে কাজ করা দরকার।

তাই ডাক্তারের নির্দেশ মতই ঔষধ খেতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত নয় এবং কোন ঔষধ বন্ধ করাও উচিত নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে ঔষধ না খেলে ক্ষতি হতে পারে। যেসব ঔষধ সারা জীবন খেতে হবে তা কখনো বন্ধ করা উচিত নয় বা নিজের ইচ্ছামত ডোজ কম বেশী করা ঠিক নয়।

খাদ্য, পথ্য এবং ঔষধ সম্পর্কে সচেতনতা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যে জরুরী প্রয়োজন। আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় যেসব শাক, সব্জি, ফল, মূল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিতে স্বাস্থ্যকর ঔষধিগুণ রয়েছে। রান্নার গুণে খাদ্যগুণ সুরক্ষিত থাকলে খাদ্য যেমন সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর হয়, তেমনি রান্নার দোষে খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। খাদ্য এবং পানীয়জল থেকেই অধিকাংশ পেটের রোগ সৃষ্টি হয়। আবার খাদ্যগুণেই রোগের প্রতিকার হয়। শরীরে পুষ্টি ও শক্তি সৃষ্টি হয়। সহজ পাচ্য সুস্বাদু খাদ্যই হল রোগীর পথ্য। আবার নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর রস, রক্ত, মাংস, হাড় ও মজ্জা থেকেই তৈরী হয় জীবনদায়ী ঔষধ। সবকিছুরই মূল শক্তি হল প্রকৃতি ও পরিবেশ।



কিডনি স্টোন

ঘরোয়া চিকিৎসা তথা প্রাথমিক চিকিৎসা

আমাদের দেশে সুদীর্ঘকাল উন্নত চিকিৎসা সহজসাধ্য বা সুলভ ছিল না। শিক্ষিত কবিরাজের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আধুনিক ডাক্তারদের আবাসস্থল ছিল শহর এলাকায়। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। ফলে ঘরে ঘরে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। সবই মুখে মুখে শুনে শুনে। কাজেই এসব পদ্ধতির অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেনি। তবুও বাধ্য হয়ে গ্রামীণ মানুষকে এসবের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে গ্রামীণ ওঝা, অর্ধশিক্ষিত পুরোহিত, বাজিকর, ফকির বা অন্যান্য ধান্ধাবাজরা। জলপড়া, মন্ত্রপড়া, তাবিজ, কবচ, এমনকি লোহা আগুনে পুড়িয়ে সেক দেওয়া, থালপড়া, বন্য গাছের শিকড় বা পশু ও মানুষের হাঁড়, মুণ্ড, মল, মূত্র ঔষধ রূপে ব্যবহার করা ইত্যাদি বহু নারকীয় চিত্র গ্রামীণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

মধ্যযুগে আয়ুর্বেদ চর্চার মাধ্যমে বৈদ্য ও কবিরাজদের পরামর্শে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া চিকিৎসাও প্রচলিত হয়েছে। তার মধ্য দিয়েই দ্রব্যগুণ সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

আধুনিক যুগে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচলন হয়েছে। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় বা অসুস্থতায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগেই জরুরী ভিত্তিতে কিছু চিকিৎসা ও সেবা যত্নের ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞান তৈরী হয়নি। স্বাধীনতার ৬২ বছর পরও এই ঘাটতি পূরণের কোন ব্যবস্থা হয়নি। তবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসার ঘটার ফলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুযোগ সহজ হয়েছে।

সবরকম উদ্ভিদ মাটি, জল এবং সূর্যের আলো থেকে নানা ধরনের মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করে, যা মানুষের শরীরকে সুস্থ, সবল এবং নীরোগ রাখতে পারে। মানুষ কিছু উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আবার কিছু উদ্ভিদ ঔষধরূপে ব্যবহার করে। এখনো পৃথিবীতে অজস্র অজানা উদ্ভিদ রয়েছে যা একদিন মানুষের উপকারে আসবে।

লেবু গাছ থেকে যেমন তেল তৈরী হয়, চন্দন গাছ থেকেও চন্দন তেল পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের শরীরে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে।

কোন কোন গাছের পাতায় ট্যানিন থাকে যা আমাদের শরীরকে নানা অস্বস্তি এবং ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। শরীরের কোথাও ক্ষত হলে এসব পাতার রস দিয়ে প্রলেপ বা সেঁক দিলে উপকার পাওয়া যায়।

কিছু কিছু গাছের তিক্ত উপাদান আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে; হজম শক্তি বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হয়।

আবার কিছু কিছু গাছে এমন সব উপাদান আছে যা আমাদের পরিপাক শক্তি বাড়িয়ে দেয় এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য কমিয়ে দেয়। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরের স্নায়ু দুর্বলতা দূর করে।

এসবই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অবদান। এগুলো ঘরোয়া চিকিৎসায় এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ সুস্থ ও সবল থাকে। আমরা এখানে সেরকম কিছু খাদ্য ও ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করবো।

সুগন্ধী গাছের ফুল, ফল, পাতা, মূল, ছাল ব্যবহার করে যে ঘরোয়া চিকিৎসা করা হয় তাকে বলে অ্যারামোপ্যাথি। যেমন - লেবু, গোলাপ, জুঁই, বেল, চাঁপা, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

তাছাড়া বট, অশ্বত্থ, অশোক, অর্জুন, অশ্বগন্ধা, আম, জাম, আমলকী, কুল, বেল, চন্দন, ছাতিম, তুলসী, নিম, নয়নতারা, নিশিন্ধা, পেঁপে, বাবলা, ডুমুর, কাঁঠাল, সজনে, কনকচাঁপা, শিউলি, সর্পগন্ধা, হরিতকী, ইত্যাদি গাছের ফল, ফুল, ছাল, আঠা ইত্যাদি নানা রোগ প্রতিরোধে এবং প্রতিকারে ঘরোয়া চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

আবার বহু লতানো গাছের পাতা, ফুল, ডাটা, ফল ও শিকড় খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয় যেমন- করলা, পটল, কলমি, চিচিঙ্গা, চাল কুমড়া, থানকুনি, ব্রাহ্মী, মেথি, জিরা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, গোলমরিচ, শুশনি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলো শুধুমাত্র ঔষধ হিসেবে ঘরোয়া চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। যেমন - চিরতা, কালমেঘ, ঘৃতকুমারী, বচ, ভেরেণ্ডা, ভুঁই আমলা ইত্যাদি।

আমরা যেসব মশলা ব্যবহার করি তার প্রত্যেকটিতে ঔষধিগুণ রয়েছে। যেকোন ঔষধ যেমন পরিমিত মাত্রায় খেতে হয় তেমনি সবরকম খাদ্য ও মশলা পরিমিত মাত্রায় খাওয়া দরকার। তাহলে শরীরের পুষ্টি, শক্তি, এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুব্যবস্থা করা সহজ হবে

আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে সর্দি, কাশি এবং সাধারণ জ্বরে তুলসীপাতা, আদা, গোলমরিচ, মধু ব্যবহার করা হয়।

পাকস্থলীকে শক্তিশালী করতে, রক্ত বিশুদ্ধ করতে হলুদের ব্যবহার চলছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই।

মেথি হল আধুনিক কুইনাইনের মত গুণসম্পন্ন। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই মেথি ভেজানো জল খাওয়ানো হয় জ্বর বা পেপটিক আলসার হলে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে এবং ডায়াবেটিস সারাতে বা বাতের ব্যথায়।

পেঁয়াজ, রসুনের ব্যবহার হয় নানা রোগ সারাতে। হাঁপানি, কুষ্ঠ, দাদ, চুলকানি, ব্রন সারাতে এমনকি ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণ করতে।

দাঁতের ব্যথায় অব্যর্থ ঔষধ হল লবঙ্গ। গলা ব্যথায় যষ্ঠী মধু, আমাশায় রোগে লজ্জাপতির ডাটা ও পাতা, কৃমিনাশ করতে চিরতার জল, বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কলমি ও সজনের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে।

হরিতকী একমাত্র ভারতবর্ষেই জন্মে। এটি একটি অতুলনীয় ঔষধি গাছ। পেটের রোগে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, হার্টের রোগে, ক্ষুধা মন্দ্য ও বদহজমে, প্লীহা এবং পিত্ত রোগ সারাতে হরিতকীর ব্যাপক ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলছে। আমলকী, হরিতকী ও বহেরা এই তিনটি ফলকে একত্রে বলা হয় ত্রিফলা। প্রতিদিন ত্রিফলার জল খেলে নানা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। পাকস্থলী, হার্ট, হাঁপানি রোগে এবং কাশি ও বমিভাব দূর করতে বা বদহজমে খুবই উপকার করে।

ধনে ও জিরা পিত্ত ঠাণ্ডা রাখে। পেটের ব্যথায় এবং বদহজমে উপকার করে। অনিদ্রা দূর করে।

মশলার মধ্যে লবণ এবং হলুদের পরেই লঙ্কার স্থান। খাদ্য সুস্বাদু করতে এবং খাদ্য হজমে সাহায্য করতে এদের জুড়ি নেই।

ঘরোয়া চিকিৎসার টুকিটাকি

১) নাক দিয়ে জল পড়লে হলুদ পুড়িয়ে শুঁকলে জলপড়া বন্ধ হবে।

২) যেকোন ব্যথা বা ফোলায় হলুদ এবং চুনের প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যাবে।

৩) কাঁচা হলুদের রস রক্ত বাড়াতে সাহায্য করে।

৪) নাক বন্ধ থাকলে গোলমরিচ পুড়িয়ে গন্ধ শুঁকলে নাক খুলে যাবে।

৫) মুখে ঘা হলে তুলসীপাতা চিবিয়ে রস খেলে উপকার হবে।

৬) সর্দি ও কাশি হলে আদা ও তুলসীপাতার রস মধুসহ খেতে হবে।

৭) মাথা ধরায় চন্দন বেটে তুলসীপাতার রস মিশিয়ে কপালে প্রলেপ দিতে হবে।

৮) বাসকপাতা, তুলসীপাতা, তেজপাতার সঙ্গে কয়েকটি গোলমরিচ মিশিয়ে জলে ফুটিয়ে কয়েকবার খেলে হুপিং কফ সেরে যাবে।

৯) কুষ্ঠবদ্ধতায় বেলের সরবত খেতে হবে।

১০) রাতে সুনিদ্রার জন্য শুশনি পাতার রস খেতে হবে।

১১) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মী শাক খেতে হবে।

১২) বমি বমি ভাব হলে আদার টুকরো মুখে রাখলে বমিভাব কমে যাবে।

১৩) পেট ফাঁপায় একচামচ আদার রসে লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

১৪) ভাইরাল জ্বর হলে নিমফল বা নিমের ছাল সেদ্ধ করে এককাপ জল খেতে হবে।

১৫) হজমের জন্য শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেতে হবে।

১৬) ডায়াবেটিস হলে খালি পেটে এককাপ করলার রস খেতে হবে।

১৭) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে রাতে একচামচ করে হরিতকী চূর্ণ খেতে হবে।

১৮) জণ্ডিস হলে অড়হর পাতার রস একচামচ করে খেতে হবে।

১৯) গাজর শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজ করে। গাজরের রস মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ায়, রক্ত পরিষ্কার করে এবং ক্ষয়রোগ এবং পিত্ত রোগ প্রতিরোধ করে।

২০) কচি ঢেঁড়শ খেলে রুচি বাড়ে, মল পরিষ্কার হয়, শরীর ঠাণ্ডা থাকে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

২১) তেলাকুচো পাতা অরুচি দূর করে, পেট পরিষ্কার রাখে, শ্বাসকষ্ট সারিয়ে তুলে, রক্তের দোষ নাশ করে। ডায়াবেটিস রোগে তেলাকুচো পাতা খুবই উপকারী।

২২) ওলের আঠা ভীমরুলের কামড়ের জ্বালা দূর করে। অর্শ রোগ সারিয়ে তোলে, পায়ের ফোলা কমিয়ে দেয়। দাঁতের ব্যথা দূর করে, ফোঁড়া ফাটিয়ে দেয়।

২৩) প্রতিদিন খাবার পর এক টুকরো কাঁচা পেঁপে চিবিয়ে খেলে খাবার হজম হয়। পেট পরিষ্কার হয়। কাঁচা পেঁপের বীজ ক্রিমি নাশ করে, পেঁপে গাছের কচিপাতা সেদ্ধ করে চায়ের মত এককাপ করে খেলে হার্টের রোগে উপকার পাওয়া যায়।

২৪) করলার রসে চিনি মিশিয়ে এক চামচ করে খেলে অর্শ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। করলার রসে হিং মিশিয়ে খেলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

২৫) পেটের অসুখে বা আমাশা হলে কাঁচাকলা সেদ্ধ করে দই মিশিয়ে খেলে আমাশা সেরে যায়। কলা গাছের শেকড় গুঁড়ো করে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে জলে মিশিয়ে খেলে রক্তাল্পতা দূর হয়।

২৬) কচুর শাক খেলে মায়েদের স্তনে দুধ বাড়ে। শরীরে বল বৃদ্ধি করে। কচুর কষ কাটা জায়গায় লাগালে রক্তপাত বন্ধ হয়।

২৭) বিছের কামড়ে সিম পাতার রস লাগালে আরাম পাওয়া যায়। জ্বালা দূর হয়। গলার ব্যথায় সিম পাতার রসের সঙ্গে চুন মিশিয়ে প্রলেপ লাগালে গলার ব্যথা কমে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসা অর্থাৎ ফার্স্ট এইড ব্যবস্থার ধারণাটি আধুনিক কালের সৃষ্টি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় আহত হলে ডাক্তারের কাছে নেবার পূর্বেই তাৎক্ষণিক যে চিকিৎসা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় তাকেই বলে প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। কিছু কিছু জরুরী প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছেই যাতে পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করে একটি হাতলযুক্ত বাক্সে প্রত্যেক পরিবারেই থাকা দরকার। এর জন্য একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিটি স্কুলেই থাকা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা নানারকম দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। তার জন্যই প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হল - ডেটল, তুলা, ব্যাণ্ডেজ, ছুরি, কাঁচি, আয়োডিন, বার্ণল, স্পিরিট, থার্মোমিটার, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসার মূলনীতিগুলো হল -

১) ধীর স্থিরভাবে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-যত্ন করার মানসিকতা ও ধৈর্য্য থাকতে হবে।

২) দুর্ঘটনায় পতিত হলে সেখানে যাতে অনাবশ্যক ব্যক্তিদের ভিড় না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৩) রক্তপাত হলে প্রথমেই রক্তপাত বন্ধের ব্যবস্থা করাতে হবে।

৪) শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ শ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে পায়ে গরম সেঁক দিয়ে তাপ বৃদ্ধি করতে হবে। গরম দুধ খাওয়াতে হবে।

৬) রোগী যাতে মানসিক শক্তি না হারায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমাগত ভরসা দিতে হবে।

৭) বেশী আঘাত হলে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে।

৮) রোগীর জামা কাপড় ঢিলে করে দিতে হবে।

৯) যত শীঘ্রই সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) হার্টের রোগীর স্ট্রোক বা হার্ট ফেলিওর হলে একমুহূর্ত দেরী না করে খুব সাবধানে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

১১) অতিরিক্ত জ্বর হলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

১২) বারবার বমি-পায়খানা হলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। রোগী যাতে দুর্বল হয়ে না পড়ে তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

১৩) যেকোন কারণে রক্তপাত হলে শরীরের যেকোন স্থানে ক্ষত বা রক্তপাত শুরু হলে প্রাথমিক ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করতে হবে। ব্যাণ্ডেজ হওয়া চাই আরামদায়ক। এর জন্য কিছু প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

১৪) শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা মচকে গেলে হাসপাতালে খুব সাবধানে নিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করতে হবে।

১৫) কোথাও কোন আঘাতে শরীরের কোন অংশ ফুলে গেলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করতে হবে।

১৬) হাতের হাড় ভেঙ্গে গেলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে হাতকে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে হয়। রোগী যাতে কষ্ট না পায় সেভাবে পরিষ্কার নরম কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।

হাড় ভাঙ্গার লক্ষণ

১) আহত স্থানে ব্যথা হয়।

২) আহত স্থানে অবশ বোধ হয়।

৩) আহত স্থানে হাড়ের বিকৃতি দেখা যায়।

৪) আহত স্থানে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে না।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) হাড় ভাঙ্গা স্থানে যদি রক্তপাত হয় তবে তা দ্রুত বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) দেহের তাপমাত্রা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩) আহত স্থানে যাতে চাপ না পড়ে সেভাবে তুলা জড়িয়ে দিতে হবে।

৪) আহত স্থানের ভাঙ্গা হাড় যাতে নাড়াচাড়া না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) আহত ব্যক্তির কোমড় বা মেরুদণ্ড যদি ভেঙ্গে যায় তবে শোয়া অবস্থায় রাখতে হবে।

৬) আহত ব্যক্তিকে কালবিলম্ব না করে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

৭) হাড় মচকে গেলে বা মাংসপেশীতে টান পড়লে পরিষ্কার কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে জল সেঁক দিতে হবে। আহত স্থানটি নরম কিছুর উপর রাখতে হবে।

৮) রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে খোলামেলা আলোযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। পোশাক ঢিলে করে দিতে হবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ঘাড় ও কানের চারপাশে বারবার মুছে দিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখতে হবে।

জলে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা

১) জলে ডোবা ব্যক্তিকে জল থেকে তুলে এনে প্রথমেই মুখে আঙ্গুল দিয়ে জল, কাদা, শ্লেষ্মা বের করে দিতে হবে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখতে হবে।

২) খোলামেলা জায়গায় রোগীর বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুর করে শোয়াতে হবে। রোগীর পেট থেকে জল বের করার জন্য মাথা নীচের দিকে রেখে জিহ্বা মুখের একদিকে এনে পিঠের দু'পাশে অল্প অল্প চাপ দিতে হবে, যাতে মুখ দিয়ে জল বের করা যায়। জল বের হলে রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে জিহ্বা সোজা করে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং গরম কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে দিতে হবে। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

কুকুরের কামড়ে যা করতে হবে

১) কুকুরে কামড় দিলে দশদিন কুকুরটির দিকে নজর রাখতে হবে। দশদিনের

মধ্যে কুকুরটি মরে গেলে জলাতঙ্ক রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। পাগলা কুকুরের লালায় রোগ জীবাণু থাকে। কাজেই সামান্য কামড়েও বিপদ ঘটে।

২) জলাতঙ্ক রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হল - রোগীর মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। জিবের নীচে ছোট ছোট ফোস্কা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) কুকুরের কামড়ের ক্ষত স্থানটি সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে ভালভাবে। ড্রেস করে দিতে হবে।

২) ডাক্তারের পরামর্শ মত জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন অবশ্যই নিতে হবে। এই রোগের জীবাণু বহুকাল শরীরে লুকিয়ে থাকতে পারে। সময় মত প্রতিষেধক না নিলে যেকোন সময় রোগের আক্রমণ প্রকাশ পেতে পারে। তখন আর চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হয়।

আগুনে পুড়ে গেলে

আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীর যত্ন ও সতর্কতা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে যা করণীয় -

১) গায়ে আগুন লাগলে ছুটোছুটি না করে দ্রুত গায়ে জল ঢেলে দিতে হবে। ভারী তোষক বা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে গায়ের আগুন নেভাতে হবে।

২) পোড়া জায়গায় তেল ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩) হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

৪) পোড়া যাওয়া স্থানে যদি গভীর ক্ষত হয় বা ফোস্কা পড়ে তবে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাসপাতালে নিতে হবে। পরিষ্কার কাপড়ে ঢেকে নিতে হবে যাতে ধূলাবালি না লাগে।

সাপের কামড়ে

আমাদের দেশে অধিকাংশ সাপেরই শরীরে বিষ নেই। বিষধর সাপের সংখ্যা বেশী নয়। বিষধর সাপদের বেশীর ভাগই সমুদ্রে থাকে। কিছু সংখ্যক থাকে পাহাড়ে, জঙ্গলে এবং পুরানো বাড়ীর ইটের গর্তে, বা মাটির গর্তে।

বিষধর সাপে কামড়ালে ২ সেন্টিমিটার ব্যবধানে দুটি দাঁতের দাগ দেখা যায়। চারটি দাঁতের দাগ থাকলে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর নয়।

সাপের কামড়ে বিষক্রিয়ার লক্ষণ

১) বিষের তীব্র যন্ত্রণা হয়।
২) শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, ঘুম ঘুম ভাব হয় এবং বমির ভাব হয়।
৩) কথা বলতে, শ্বাস নিতে, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়।
৪) মাংসপেশীতে খিচুনী হয় এবং রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) বিষ যাতে শরীরে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য ক্ষতস্থান থেকে একটু দূরে দড়ি বা ফিতা দিয়ে শক্ত করে কষে পর পর দুটো বাঁধন দিতে হবে।
২) কামড়ানো জায়গা থেকে বিষাক্ত রক্ত বের করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন ব্লেড ব্যবহার করা উচিত। একটু পুড়িয়ে নিতে পারলে ভালো।
৩) রোগীকে সাহস দিতে হবে যাতে ভয় না পায়। অনেক সময় ভয় পেয়ে রোগী হার্ট ফেল করে।
৪) যত শীঘ্র সম্ভব একটি বড় হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে বিষধর সাপের কামড়ে একমাত্র চিকিৎসা হল এন্টিভেনিন ইনজেকশন। অন্যসবই হল বুজরুকি।

বৈদ্যুতিক শক

আজকাল ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাচ্ছে। সুইচ খারাপ হলে, বিদ্যুতের লাইনের তারে কোথাও গোলমাল হলে, ইস্ত্রি করতে বা বৈদ্যুতিক কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রাথমিক সাবধানতার জ্ঞান থাকা দরকার।

১) প্রথমেই সুইজ বন্ধ করে দিতে হবে। মেইন সুইচও বন্ধ করা দরকার।
২) সুইচ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্পর্শ করা যাবে না। বিদ্যুত প্রবাহ থেকে মুক্ত করার জন্য লাঠি বা কাঠের সাহায্যে রোগীকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
৩) রোগীর শরীর যাতে ঠাণ্ডা না হয়ে যায় সেজন্য গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিতে হবে। হাত ও পায়ের তলা ঘর্ষণ করে শরীর গরম রাখতে হবে।
৪) শ্বাস বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস চালু করতে হবে।
৫) যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।